শাদায় কালোয় নকশা

আশাপূর্ণা দেবী

পরিবেশক ঃ

মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

চির আদরের—

সুশান্ত ও নুপুরকে—

সুবীর অবাক হয়ে বলল, তুমি তাকে একেবারে নিয়ে চলে এসেছ ?

লুনা আরো অবাক হয়ে বলল, একেবারে মানে ? বারে বারে ছুটব নাকি সেখানে ?

সুবীর একটু আহত হল। এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল লুনা, অথচ সুবীরের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দূরে থাক, একটু জানাল না পর্যন্ত। চলে আসার আগে, ওর কাকার বাড়ি থেকে একটা ট্রাঙ্ককলও তো করতে পারত ! খুব বিরক্তি লাগল সুবীরের।

তবু সহজভাবে বলার চেষ্টা করল, না। মানে, আমায় একবার জানালে পারতে !

লুনা বোধহয় অনুধাবন করছে তার দিকের পাল্লাটা একটু হালকা হয়ে যাচ্ছে, লুনা তাই নিজেকেই ভারী করে সেদিকে চাপান দিয়ে বলল, অনুমতি নেবার কথা বলছ ?

এতে সুবীর আরো আহত হল, আশ্চর্যও হল। লুনা হঠাৎ এভাবে কথা বলল কেন ? লুনারই তো বরং একটু কুণ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, সুবীরকে না বলে-কয়ে, তাদের এই মাত্র দুজনের সংসারে একটা অনাত্মীয় যুবতী মেয়েকে এনে হাজির করল একেবারে চিরকালের মত দায়িত্বদায় নিয়ে। অন্তত লুনার কথা শুনে তো তাই মনে হল।

লুনা যতই ওকে পরমাত্মীয় ভাবুক, মেয়েটার মা তো আর লুনার সত্যি মাসি নয়। পাতানো মাসি। বিয়ের আগে কবে নাকি দুটো পরিবার পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেছিল, এবং ভালবাসার জোয়ারে দুটো পরিবার একটি পরিবারে দাঁড়িয়েছিল। তা এমন তো ঘটেই। আকছারই ঘটে। মেয়েরা যখন ভাব-ভালবাসার জোয়ারে গা ভাসায়, তখন তো আর মাত্রা রাখে না।

দু বাড়িতে দুটো বয়েসমাফিক ছেলেমেয়ে থাকলে তো কথাই নেই, কে জানে সে স্রোত কোথায় গিয়ে ঠেকে। তবে বউতে বউতে গিন্নিতে গিন্নিতে ভালবাসাও কম যায় না।

দু বাড়ির পুরুষ, বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করেও 'আপনি' আর

'বাবু' বজায় রেখে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েদের ? বেড়া ভাঙতে দু'চার দিনের বেশি লাগে না।

ক্রমশই এ বাড়ির মহিলা ও বাড়িতে, আর ও বাড়ির মহিলা এ বাড়িতে দুপুর কাটাতে শুরু করেন, এবং এ বাড়ির বাচ্চারা ও বাড়িতে আর ও বাড়ির বাচ্চারা এ বাড়িতে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র পেয়ে যায়, আর মাসি কাকি জ্যেঠি মামি ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

এরা কোথাও বেড়াতে গেলে, ছেলেপুলেকে ও বাড়িতে রেখে দিয়ে যায়, আর ওরা এ বাড়িতে। সিনেমা থিয়েটার জলসায় অথবা পুজোর বাজার বিয়ের বাজার করতে গেলে অপর পক্ষকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেরা যাবার কথা ভাবতেই পারে না। এমন কি এদের ছোট ছেলেমেয়েরা ওদের নিজেদের মামারবাড়ি এবং ওদের ছেলেমেয়েরা এদের ছেলেদের মামারবাড়ি কাটিয়ে আসার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

বাড়ির পুরুষরা এতটা মাখামাখি গলাগলি খুব একটা যে পছন্দ করেন, তা নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে তো আর কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম হয় না।

আবার হঠাৎ কোনদিন কোনো কারণে যদি একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়, মেয়েরাই পারে জোয়ারের মুখে পাথরের চাঁই বসিয়ে দিয়ে গতিস্রোত রুদ্ধ করে ফেলতে। তখন কথা বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, বিরোধীতাকে ক্রমশ নীচতায় নিয়ে অসভ্যতায় পরিণত করে ফেলতে দ্বিধামাত্র নেই। শিশুদের পর্যন্ত সেই অসভ্যতায় তালিম দেওয়া হয়।

পুরুষরা আবার এতটা বরদাস্ত করতে পারে না, লজ্জিত হয় কুণ্ঠিত হয় বিস্মিত হয়। কিন্তু তাতে মহিলাদের দমানো যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই এরকম দেখা যায়।

কিন্তু লুনাদের বাড়ির সঙ্গে তার 'মণ্টিমাসি'দের বাড়ির চিরদিনই গাঁট-ছড়া বাঁধা ছিল। একদিনের জন্যেও টসকায়নি।

কাকার ট্রাঙ্ককলে মণ্টিমাসির শেষ অবস্থা শুনে লুনার সেইসব পুরনো স্মৃতি উথলে উঠেছিল। লুনা যেন অতীতে হারিয়ে যাচ্ছিল। বরকে বলে চলেছিল, জান, এমন দিন যেত না এ বাড়ির রান্না ঘরের অবদান ও বাড়িতে যাচ্ছে না, আর ও বাড়িরটা এ বাড়িতে আসছে না। আমাদের ফ্রিজ কেনা হল, ও বাড়িতে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল সাপ্লাই। ওদের বাড়িতে মাছ-টাছ বেশি এসে গেল তো নিয়ে এসে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে গেলেন মণ্টিমাসি।

আবার উনি একটা নিউ মডেল উষা মেসিন কিনলেন, তো আমাদের যত সেলাই সেইখান থেকে।

বলেই চলেছিল লুনা তখন আবেগের বশে।

সুবীর অবশ্য মনে মনে হেসেছিল। সে হাসির অর্থ একেবারে টিপিক্যাল সার্বেকি প্যাটার্ন। আধুনিক মানসিকতায় এরকম গলায় গলায় হয় না।

কিন্তু লুনার সামনে তো আর হেসে ওঠা যায় না। লুনা তখন সেই প্রেমাকুল দিনগুলির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

তা বলে এ কথা ভাবেনি সুবীর, লুনা ওই ট্রাঙ্ককলটি পাওয়া মাত্রই বার্নপুরে ছুটবে। অথচ লুনা তাই করেছিল। তক্ষুনি একটা ছোট স্যুটকেস গুছিয়ে ফেলেছিল এবং ফ্রকপরা কৃষ্ণাটাকে সংসারের সব খুঁটিনাটির ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে শুরু করেছিল। আর তারই মধ্যে অলককে খবর দিয়ে সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বলে চলেছিল, কবে মণ্টিমাসি লুনার মার খুব অসুখের সময় কুড়ি পঁচিশ দিন লুনাদের সকলের জন্যে রান্না করে করে পাঠিয়ে ছিলেন। লুনার মাকে রোগীর পথ্য করে এনে এনে খাইয়ে গিয়েছিলেন।

সুবীর তখন না বলে পারেনি, তা এতদিনের মধ্যে তো কই কোনো যোগাযোগ দেখিনি।

লুনা তখন অনুতাপে জর্জর, তাই সুবীরের কথাটা অপছন্দ হলেও উদাস ভাবেই বলেছিল, সে এমন কিছু না। আমারই অ্যালাকাড়ি।

সেই অ্যালাকাড়ির ত্রুটিস্খালন করতেই যে লুনার হঠাৎ মণ্টিমাসি সম্পর্কে এতটা চেতনা উথলে উঠেছিল, তা বুঝেছিল সুবীর। তাই বলে এতটা? মণ্টিমাসির মা-মরা যুবতী মেয়েটাকে গলায় গেঁথে চলে আসা?

ভারী রাগ হল সুবীরের লুনার কাকার ওপর। এতই যদি মানবিকতা সদ্য মাতৃহারা মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেই পারতেন? তা আর পেরেছেন, লুনার কাকি তো আর লুনার মত বোকা নয়। অথচ এটা ওরই করার কথা ছিল! চাকরির সূত্রে ওই মণ্টিমেসো আর কাকা যখন একই জায়গায় গিয়ে পড়ে পুরনো ভালবাসাকে আবার ঝালাচ্ছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ভাইঝিকে টেলিফোন করা হল, লুনা তোর মণ্টিমাসি মৃত্যুশয্যায় তোকে একবার দেখবার জন্যে খুব ব্যাকুল। কিন্তু তারপর? মহিলার

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুমারী মেয়েটিকে ভাইঝির ঘাড়ে চাপিয়ে দিব্যি দায়-মুক্ত হলেন।

কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করলেও হঠাৎ সুবীর নিজের মনের সংকীর্ণতা দেখে একটু লজ্জা পেল। সত্যি তো আর সুবীর এমন সংকীর্ণ-চিত্ত নয়। কিন্তু সুবীর তাদের এই যুগলের সংসারে হঠাৎ বিনা নোটিসে একটি পূর্ণ যুবতী মেয়েকে এনে ফেলায়, ভারী বিরক্তিবোধ করছিল।

সুবীরের তখন মনে হয়েছিল লুনা যেন একটু বেশি বেশি কথা বলছে। লুনা কি তার এই ছুটে যাবার স্বপক্ষে নিজেই নিজের জন্যে যুক্তি খাড়া করছে। যেন মণ্টিমাসি একদা এত উপকার করেছিলেন, আর আমি ওকে শেষ সময় একবার দেখতেও যাব না? আমায় দেখতে চেয়েছেন শুনেও।

তবু সুবীর একবার বলেই ফেলেছিল, তা আজই, এখনি চলে যাবার কী খুব দরকার আছে। আর একটা খবর নিলেও হত।

সুবীরের সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

অলককে তুমি বিনা নোটিসে অমনি ঘণ্টা দু তিনের মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে বলে পাঠালে, পিসিমা পছন্দ করবেন কি না করবেন ভাবলেও না। হতে পারে অলক এখন পরীক্ষা দিয়ে লম্বা ছুটিতে বাড়ি বসে আছে। তাহলেও, একেবারে একজন অচেনা জনের অসুখের জন্যে বাড়ি থেকে রেল-গাড়ি চেপে পাড়ি, তাও কদিনের জন্যে কে জানে? এমনও তো হতে পারে লুনার কাকা, একটু বেশি করে অবস্থার গুরুত্বর কথা বলেছিলেন। অথবা, লুনাই একটুখানিকে অনেকখানি ভেবে এমন অস্থিরতা প্রকাশ করছে।

মোটের ওপর সুবীরের ভাল লাগছিল না।

লুনা প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিল সুবীর যেন লুনার এই আকুলতাকে গ্রাহ্যই করছে না। যেন কথাগুলো ওর কানে ঢুকছেও না। লুনার এই এক্ষুনি বার্নপুরে ছোটাটাকে যেন বাড়াবাড়ি ভাবছে। বোধহয় কথাটা ভাবামাত্রই লুনা তীক্ষ্ণ হয়েছিল। বলেছিল, আরও একবার খবর নিয়ে? সেটা অবশ্য শেষ খবরই হবে। যখন যাবার আর কোনো মানে থাকবে না।

অথচ এই লুনাই ওই ট্রাঙ্ককলটা পাবার আগের মুহূর্তেও কী সুন্দর করে হাসছিল। তার নমনীয় মিষ্টি মুখটায় আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। বরাবরই খুব সরল আর মিষ্টি মেয়ে লুনা।

আচ্ছা কিসের কথা হচ্ছিল তখন? ওঃ! লুনা বলছিল, আর আত্তায়

কাজ নেই বাবা, রান্নাঘরটা আমার বিরহে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তুমি তোমার 'কেশবতী কন্যা', 'হরিণনয়না তরুণী,' 'ললিতলবঙ্গলতা সুন্দরী'দের নিয়ে মশগুল থাক।

সুবীর বলতে যাচ্ছিল, উপায় কী? কায়া যখন হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তখন ছায়া নিয়েই থাকতে হবে। কিন্তু বলা হল না, ফোনটা বেজে উঠল।

সুবীরের হাতের কাছেই টেলিফোনটা, ওরই তো সর্বদা দরকার। ও রিসিভারটা তুলেই শুনে নিয়ে লুনার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, ট্রাঙ্ককল, বার্নপুর থেকে।

বার্নপুর থেকে শুনেই লুনার মুখটা শুকিয়ে গেল। সুবীরকে ইশারায় বলল, তুমিই শোনো না কে কী বলছে।

সুবীর চেঁচিয়ে বলল, ওঃ! কাকা? হ্যাঁ—আমি সুবীর বলছি। লুনা? হ্যাঁ আছে। দিচ্ছি।

কাকা নিজেই ফোন করছেন শুনে লুনা একটু ভরসা পেল। এত নার্ভাস স্বভাবের মেয়ে লুনা, টেলিগ্রাম কি ট্রাঙ্ককলল শুনলেই ওর ভয় করতে থাকে। টেলিগ্রাম তো নিয়ে খুলে পড়তেই চায় না। এমনকি একটু বেশী রাতের দিকে ফোন এলে ভয়ে ভয়ে বলে, তুমি ধরো না।

লুনা এখন শক্ত হাতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে আস্তে বলল, কাকা, আমি বলছি।

তারপর সুবীর ছোট্ট ছোট্ট এক একটা শব্দ শুনতে পেল, অ্যাঁ! সে কী? কই আগে তো জানাওনি।…রাত আটটা পঞ্চান্নয়? ঠিক আছে? তোমরা… আচ্ছা! সাবধানে থেকো।…হ্যাঁ আজই। জানি না তাও দেখা হবে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা ছাড়লাম। উঃ! শেষ অবস্থা!

রিসিভারটাকে নামিয়ে লুনা হতাশভাবে সোফায় বসে পড়ল।

সুবীর বুঝতে পারছিল না কার 'শেষ অবস্থা'র খবরে এত বিচলিত হচ্ছে লুনা।

অতঃপর বলল লুনা।

সুবীর অবাকই হয়েছিল। 'মণ্টিমাসি' শব্দটা অবশ্য সুবীর শুনেছে আগে। কিন্তু তাঁর 'শেষ অবস্থা'র খবর শুনে লুনা এক্ষুনি যেতে চাইবে, এমন সম্পর্ক ছিল কী?

সাবধানে বলেছিল সুবীর, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যে এতটা ইয়ে, কই তেমন যোগাযোগ তো দেখিনি।

লনা অন্যমনস্ক ছিল, সে বোধহয় তখনি অতীতে তলিয়ে যাচ্ছিল। উদাস-উদাস ভাবে বলেছিল, আমারই দোষ! আলাদা চিঠিপত্তর তেমন দিতাম না। ওই কাকার চিঠিতে যা খবর-টবর। মণ্টিমেসো মারা যাবার খবরেও, যাব যাব করেও কই আর গেলাম! ছন্দার বিয়ে লাগল। চলে গেলাম তোমার দিদির বাড়ি। তারপর কাজের লোকটা হঠাৎ ছেড়ে গেল, একটা পর একটা তো চলেছেই। আমিই অকৃতজ্ঞ।

লনার এই আত্মগ্লানির ভার কমাতে, সুবীর সময়ের আন্দাজ না করেই ঝপ করে বলে ফেলল, ইয়ে তখন তো তোমার শরীর খুব খারাপ!

'খুব ভাল শরীর' আর কোন কালে কোন মেয়েটার থাকে? আর, থাকলে স্বীকার-ই বা কে করে?' কাজেই লনা এ কথায় প্রতিবাদ করে উঠল না। মেনে নিয়েই বলেছিল, সে এমন কিছু না। আমরাই অ্যালাকাড়ি।

এসব ফোন পাওয়ার পরের কথা।

সেই ত্রুটির অনুতাপেই যে লনার হঠাৎ মণ্টিমাসি সম্পর্কে এত চেতনা, তা বুঝতে পেরেছিল সুবীর। তাই লনার সেই রাত্রেই চলে যাওয়াটাকে মনের মধ্যে মেনেই নিয়েছিল।

কিন্তু তাই বলে এত?

তিনদিন তিনরাত সেখানে কাটিয়ে ফিরে এল কিনা একটা সদ্য মাতৃহারা মেয়েকে ঘাড়ে নিয়ে। তাও সুবীরের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে।

সুবীর সঙ্কীর্ণচিত্ত মানুষ নয়। সুবীর নিজেকে এবং নিজের পরিমণ্ডলকে সবই লনার হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু এটা এমন একটা ব্যাপার যা তার সেই নিশ্চিন্ততায় চিড় খেল।

খুব বিরক্তি এল লনার কাকার ওপরও। এতই যদি মানবিকতাবোধ, মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেই পারতেন। হুঁ, তা আর পারতে হয় না। কাকি তো আর লনার মত বোকা নয়। রীতিমত প্র্যাকটিক্যাল মহিলা। এই যে লনার মা নেই, আর বাবা ছেলের কাছে আমেরিকায় গিয়ে পড়ে আছেন, কাকা কি তেমন কিছু করেন? ওই কদাচ এক আধটা চিঠি। তাও ওই জাঁদরেল মহিলাটিই লেখেন, নিশ্চিন্ত হয়ে বরের হাতে ছেড়ে দেন না।

এসব কথা কোনদিনই মনে পড়েনি সুবীরের, আজই হঠাৎ মনে হল। ভাবল, লুনাকে অমন ব্যস্তভাবে ট্রাঙ্ককল করার বুদ্ধিটি নির্ঘাত ওই বুদ্ধিমতী মহিলাটির। বুঝতেই পারছিলেন লুনার মণ্টিমাসি আর বাঁচবেন না, তখন ঠিক ওই মেয়েটির দায়িত্ব ও'দের ওপরই পড়ে যাবে। মেসো তো আগেই গেছেন, আর তো কেউ নেই ওদের ওখানে।

কাকার সঙ্গে মণ্টিমাসির অবশ্য আলাদা কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্কের সূত্রটি লুনার মতই। তবে ব্যাপারটা এই কর্মসূত্রে অনেকদিন পরে লুনার কাকার আর মণ্টিমেসোর আবার পাশাপাশি কোয়ার্টার্সে বাস। অতএব পুরনো ভাব ঝালাই!

কোনখানে ছিটেফোঁটাও প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার নেই, সবই নির্ভেজাল প্রীতি-ভালবাসা। সুখের পানসি তরতরিয়েই চলত পুরুষ দুটির অবসর নেওয়ার কাল পর্যন্ত। কিন্তু ভাগ্য বিরোধিতা করল। মণ্টিমেসো হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন, আর তখনই ধরা পড়ল, মণ্টিমাসির মধ্যে মৃত্যু রোগের বাসা।

এসব সুবীরের দু-এক লাইন শোনা। তেমন মন-কান দিয়ে শোনেওনি। এখন এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েই সুবীর এত সব ভাবতে বসেছে।

মণ্টিমেসোর মৃত্যুকালেই নাকি মাসি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই সরকারের বদান্যতায় সরকারি কোয়ার্টাসে এতদিন পর্যন্ত থাকতে পেরে-ছিলেন। তিনি মারা যাবার পরও তাঁর মেয়েকে থাকতে দেবে, এতো আর হয় না। তাছাড়া ওই বয়েসের একটা মেয়ের পক্ষে তো একা থাকা সম্ভব নয়।

অবশেষে দুই আর দুয়ের হিসেব। যেহেতু 'মণ্টিমাসি' মারা গেলেই তাঁর মেয়েকে নিজেদের কাছে নিয়ে চলে আসা ছাড়া আর গতি থাকবে না কাকার, সেই হেতুই আর একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

ভেবেচিন্তে মুশকিল আসান।

লুনাকে একবার সেই মোক্ষম সময়ে বার্নপুরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই মেয়েটাকে লুনার সঙ্গে কলকাতায় চালান করে দেওয়া যাবে। লুনা যে বেশ একটু সেণ্টিমেণ্টাল তা তো আর ওনার জানা নেই তা নয়।

তাই ফোনে বলা হল, লুনা, মণ্টিবউদি তোকে একবার দেখতে চেয়েছে

কখন বললেন ? যখন লুনার আর দেখা দিয়ে আবার ফিরে আসাব সময় থাকবে না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন চমকে গেল সুবীর। ইস কী ভেবে চলেছি তখন থেকে। আমি এমন 'ছোট মন' হয়ে গেলাম কী করে ? লুনা তো বরাবরই নরম মনের মেয়ে, ও নিশ্চয় নিজে থেকেই বলেছে, ওকে আমার কাছে নিয়ে যাই। লুনা নিজে মাকে হারিয়েছে, ওর তো সহানুভূতি আসবেই।

মন থেকে এ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে সুবীর নিজের কাজ নিয়ে বসতে চেষ্টা করল।

কিন্তু বারে বারে মনের মধ্যে একটা ছায়া ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তার আর লুনার এই আঁটসাঁট ছন্দে গাঁথা সংসার কবিতারটি মধ্যে হঠাৎ একটা বাড়তি অক্ষর ঢুকে পড়ে ছন্দভঙ্গ করে দিতে চাইছে।

সুবীরের সেই অবাধ স্বচ্ছন্দ অবস্থাটি কি আর বজায় থাকবে ? সুবীর কি আর যখন তখন হঠাৎ ইচ্ছে হলেই লুনাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে ? ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডেকে বলে উঠতে পারবে, লুনা শিগগির চলে এস ভীষণ দরকার। আর লুনা ছুটতে ছুটতে চলে এসে বলে উঠতে পারবে, এই শোনো ওই জানালার সামনেটায় একবার গ্রীল ধরে একটু দাঁড়িয়ে পড়ো দিকি। নট নড়ন নট কিছু। জাস্ট মিনিট দুই।

দু মিনিটের মধ্যেই কি হয়ে যায় সবসময় ? লুনা ব্যস্ত হয় 'দাঁড়াও গ্যাসটা নিবিয়ে আসি।'

সুবীর বলে, রাখো তো গ্যাস ! দারুণ দেখাচ্ছে এখন তোমায়। একদম নড়বে না !

বেশ কয়েক বছর বিয়ে হয়েছে সুবীর লুনার, এখনো ছেলেমেয়ে হয়নি, বেপরোয়া ভাবটায় অভ্যাস হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব।

নাঃ ! কাজে মন বসানো যাচ্ছে না ! একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলল, চুপ করে চেয়ারে বসে থেকে।

লুনার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে গেস্টকে নিয়ে ব্যস্ত।

থাকো বাবা তাই। তিন চারদিন পরে বাড়ি ফিরলে, উচিত ছিল না

কিছুক্ষণ অন্তত স্ববীরের কাছে বসা। তা নয়, দু চারটে কাটা কাটা কথা বলে চলে যাওয়া হল। খানিক পরেই তো স্ববীর অফিস চলে যাবে। তারপর তো সারাদিনটাই হাতে, দুই সখীতে যত পারবে গল্প করবে।

তা নয়, রাগ!

ওই যে আমি ওর মাসির মেয়েকে হুট করে নিয়ে আসাটায় খুব উৎসাহ দেখাইনি। কী করব? আমার যদি উৎসাহ না আসে!

অবশ্য অভিমানও হতে পারে। লুনা তো আবার সেই ধরনেরই মেয়ে। তা তুমি যতই অভিমান-টভিমান করো লুনা, আমি কিন্তু বলতে ছাড়ব না, খুব বাজে একটা বোকামি করে বসেছ তুমি। দু দশ দিনের জন্যে নয়, একেবারে বলে বসলে কিনা আমি মণ্টিমাসির মৃত্যুকালে কথা দিয়েছি টুনির ভার আমি নিলাম।

বুঝলাম মানবিকতা।

কিন্তু এই একটা হতভাগা লোকের ওপর কতটা অমানবিকতা প্রকাশ করা হল, সেটা ভেবেছ? এখন থেকে আমার সারাক্ষণ বুঝে সমঝে চলতে হবে। উঃ! বেশ বুঝেছি কাজের বারোটা বেজে যাবে আমার। সুখেরও।

স্ববীর একটা অবাঙালি পরিচালিত মোটামুটি নামকরা বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করে, আর অবসরকালে বাংলা বইয়ের মলাটের ছবি আঁকে। প্রচ্ছদ-শিল্পী হিসেবে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট সুবীর সামন্তর বেশ নাম হয়ে গেছে।

দুটো কাজই অবশ্য একই ধরনের। অফিসের কাজ হচ্ছে প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বিভাগে আর বইয়ের মলাট বেশির ভাগই গল্প উপন্যাসের। দুটো ক্ষেত্রেই নারীমূর্তির অগ্রাধিকার। যার জন্যে লুনা, ওকে 'কেশবতী কন্যা' 'হরিণনয়না'দের নিয়ে মগ্ন থাকে বলে ঠাট্টা করে।

তবু কেবলমাত্র নারীমূর্তিই নয়, (হয়তো সেটাই প্রধান) নতুন নতুন আইডিয়া মাথায় আনতে পারায় প্রশংসা পাচ্ছে বেশ স্ববীর।

কিন্তু এই কাজটার জন্যে যে স্ববীরের একটু নির্ভৃতির প্রয়োজন, সেটা বুঝল না লুনা!

কৃষ্ণা এসে বলল, আজ আপনার অফিস নেই মেসোমশাই? এখনো চানে যাননি?

মকে উঠল সুবীর। ঘড়ির দিকে তাকাল। কখন এতগুলো সময় বেজে গেল ?

লুনা তো ফিরেছে সেই কোন ভোরে। তখন থেকেই তো এক ভাবে বসে রয়েছে সুবীর।

সরকারী অফিসের মত দশটা-পাঁচটা নয়, বেলা এগারোটা নাগাদ অফিসের উদ্দেশে রওনা হয় সুবীর। পেঁছে গিয়ে প্রথমেই এককাপ চা খায়, অতঃপর গোটা দুই সিগারেট। বারোটা বাজলে কাজে হাত।

এখন এখানেই সাড়ে এগারো বেজে গেছে। বলল, তুই চটপট খেতে দিগে যা, আমি আসছি চান করে।

আশ্চর্য ! এতক্ষণে মনে পড়ল লুনার সুবীরকে সময়ের হুঁশ করিয়ে দিতে !

কৃষ্ণা সবগুলো দাঁত বার করে বলল, আজ আবার আমি খেতে দেব কি ? মাসিমা এসে গেছে না ?

শুনে বাঁচল সুবীর। ওঃ এতক্ষণ তাহলে লুনা ওই কর্মেই ব্যস্ত আছে। তিন চারদিন কৃষ্ণার হাতে ছিল, নিশ্চয় খুব আজেবাজে করে রেখেছিল সব।

তবু বলল, মাসিমা এল আর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল ? আর একটা দিন চালিয়ে দিতে পারলি না ?

আহা ! মাসিমা ছেড়ে দিলে তো !

ফ্রক পরাই হোক আর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হোক, কৃষ্ণা নারীজনোচিত ঝঙ্কারে দিব্যি পটু হয়ে বসে আছে।

খাবার টেবিলে এসে সুবীরের মনটা আবার বিগড়ে গেল ! টেবিলে একখানা মাত্র থালা।

বরাবরের নিয়ম দুজনে একসঙ্গে খায়। এই অফিস বেলাতেও। সুবীর বলে, একসঙ্গে খাওয়াটা, একসঙ্গে শোওয়ার থেকে কিছু কম নয়। তা সেই আনন্দলাভটাই নিয়ম হয়ে গেছে।

আজ তার ব্যতিক্রম। কারণ নিশ্চয় সেই গেস্ট !

তবু সুবীর বলে না ফেলে পারল না, তোমার ?

লুনা হতবাক হয়েও বলে উঠল, আমি ? এখন ! টুনিকে ফেলে ?

আহা ফেলেই বা কেন ? ওঁকেও তো বসিয়ে দিতে পারতে !

লনা সংক্ষেপে বলল, ও এখন এখানে খাবে না।

সুবীর কথা বাড়াতে চাইল। বলল, ইয়ে না খাবার কী আছে? দুজনেই তো টায়ার্ড হয়ে এসেছ, খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিতে পারতে।

লনা গম্ভীর। বলল, ওর মা মারা যাওয়ার অশৌচ, এসব খাবে না।

সুবীর মিইয়ে গেল।

তার মানে লনার কপালে অনেক খাটুনি। অশৌচের পরে শ্রাদ্ধ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে!

নিঃশব্দে খেয়ে উঠে এল।

লনা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল না। তুমি আজ বেরোতে এত দেরি করলে যে?

এমনি। আলস্য লাগছিল।

তারপর ইচ্ছে করেই বলল, এই কদিনে সব রুমাল গুলোই বোধহয় খতম করে রেখেছি!

কদিন নয়, তিনদিন। কৃষ্ণাকে বলতে পারতে কেচে রাখতে।

সুবীর একটু হাসবার চেষ্টা করল। অভ্যাস খারাপ করে রেখেছ। দেখো দিকি যদি একটা ফর্সা রুমাল পেয়ে যাও। চটপট।

লনা তখন একটু কুণ্ঠিত হল। আস্তে বলল, আমার এখন কাচা কাপড়। টুনির জন্যের রান্না করছি।

কাচা কাপড়। শুনেও যেন শিউরে উঠল সুবীর।

কোন অতীতকালের কথা যেন শুনল সে।

কবে কোনকালে মা-পিসিমা-ঠাকুরমার মুখে শুনত যেন কথাটা।

ওঃ—বলে রুমাল না নিয়েই চলে গেল জোর পায়ে।

লনার মুখচ্ছবিখানি তাকিয়েও দেখল না।

কাচা কাপড়। লনার মুখে। কী কুৎসিত কথা।

বরুণ বলল, কি সামন্তদা, বউদি আজও ফেরেননি বুঝি।

সুবীর বলল, কে বলল? ফিরেছেন তো?

তবে? মুখটা যেন বোদা বোদা! ঝগড়া হয়েছে?

বাজে কথা রাখো।

ওঃ। তাহলে তো সিওর। বরুণের কখনো অনুমানে ভুল হয় না।

অত অহমিকা ভাল না।

ঠিক আছে বাবা! তো কার যেন অসুখ শুনে গিয়েছিলেন! ভাল আছেন?

না, মারা গেছেন!

ওঃ—ইস।

বরুণ বলল, মাপ করে দিন দাদা! বুঝতে পারিনি। তাই মুখটা—

তার জন্যে আমার মুখ শুকোবার কারণ নেই।

সুবীর যেন ইচ্ছে করেই রূঢ় হল। বলল, গিন্নীর বাল্যকালের পাতানো মাসি। এই হচ্ছে রিলেশন। গল্প রাখো, কই দেখি কী আছে?

বরুণ বিজ্ঞাপন কালেকশন করে আনে। অথবা বিজ্ঞাপনদাতারা ওর কাছে দিয়ে যায় তাদের বিষয়বস্তু, আর বক্তব্য।

চা এল। সেটা শেষ করে, সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ফাইলপত্র উল্টোতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। আবার কাজে ডুবেও গেল একসময়।

লুনার খুব খারাপ লাগছিল। সুবীর যে লুনার এই টুনিকে নিয়ে চলে আসাটা পছন্দ করেনি, সে তো বুঝতেই পারছে। আর পারছে বলেই মন-মেজাজ খারাপ লাগছে। বরাবর জেনে আসছে লুনা, তার বর একটি আলা-ভোলা, সংসার সম্পর্কে দৃকপাত নেই। লুনার ওপরই সমস্তটা নির্ভর। অথচ যেই লুনা নিজের মত করে ভেবে একটা কাজ করেছে, অমনি আলা-ভোলামিটি উবে গিয়ে কর্তৃত্বের অভিমান ফুটে উঠল। তাছাড়া ভাবতে খুব কষ্ট হল লুনার, সুবীর এমন। সংসারে একটা বাড়তি মানুষ আসতে দেখেই অন্যরকম হয়ে গেল। মনে মনে বোধহয় হিসেব করতে বসল, আজকালকার দিন একটা মানুষের কত খরচ।

হ্যাঁ নিশ্চয়। এ কথাই ভেবেছে সুবীর। না হলে ভদ্রতা করেও একবার দেখা করল না টুনির সঙ্গে। একেবারে যে চেনে না তাও তো নয়। দেখে-ছিল তো কাকার মেয়ের বিয়ের সময়। তখনো অবশ্য শাড়ি ধরেনি টুনি। তাহলেও, এখন একেবারে চিনতে না পাবার মত নয়। কই, বলল না তো একবার দেখা করবে টুনির সঙ্গে। লুনাই বা সেধে বলতে যাবে কেন? মান নেই বুঝি?

অবশ্য বললেই কি দেখা করবে টুনি?

ঘর থেকেই তো বেরোলই না সারাদিনে, খাওয়াও সেই রকমই। কষ্ট করে কাচা কাপড়ে আলাদা করে রান্না করাই সার। চুপচাপ শুয়েই আছে সারাদিন। বিকেলে যখন আকাশের কোণে মেঘ জমেছে, আর শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে কালবৈশাখীর ইশারা নিয়ে, তখন শুধু উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার এই ছোট্ট সংসারটিতে আমার এসে পড়াটা ঠিক ওই ঝড়ের মত, তাই না লুনাদি ?

লুনা বলেছিল, বেশি পাকামি করতে হবে না। কিন্তু লুনার ভাবনা হয়েছিল, সুবীর যদি স্বাভাবিক ব্যবহার না করে, যদি ছাড়াছাড়া ভাবে থাকে, নাঃ, এটা ওকে বোঝাতে হবে।

কিন্তু কখন ? আজ তো আর রাত্রে নিভৃতে দেখা হবার উপায় নেই, টুনিকে তো একা শুতে দেওয়া যায় না। এ কথাটা ভাবামাত্র প্রাণের মধ্যে একটা শূন্যতা এসে গেল, মনে পড়ল তিনরাত্তির পরে আজ ফিরছে লুনা। যেদিন পৌঁছেছে লুনা, সেই রাত্রেই তো মারা গেলেন মণ্টিমাসি। বলতে গেলে মারা গিয়েই পড়ে থেকে ছিলেন প্রায়।

অলক বসেছিল সুবীরের অপেক্ষায়। ওকে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, ফিরতে তোমার এত দেরি হয় সুবীরদা।

রোজ হয় না। কতক্ষণ এসেছিস ?

অনেকক্ষণ।

চা-টা খেয়েছিস ?

বউদি সেধেছিল, খাইনি।

কেন ? হঠাৎ এত অহঙ্কার !

ধ্যাৎ কী যে বলো ! ভাবছিলাম তুমি এসে যাবে। একসঙ্গেই খাওয়া যাবে। দুবার করে খাটবে বউদি।

দয়ার অবতার। এ খাটুনিতে তোর বউদির লাভ বৈ কষ্ট নেই। বাড়তি আর একবার চা হয়ে যাবে।

ইস ! তুমি এমন বলো সুবীরদা। বউদি মোটেই ওরকম নয়।

কী নয় ? চা-প্রেমী নয় ?

তা বলছি না। মানে—

থাক তোকে আর মানে খুঁজতে হবে না। সকালে অমন তাড়াতাড়ি চলে গেলি কেন ? ভেবেছিলাম একটু চা-টা খেয়ে যাবি।

ওঃ বাবা! চেন তো নিজের পিসিটাকে! কদিন বাড়ি ছিলাম না, কলকাতায় এসে গিয়েও আবার দেরি করলে রক্ষে আছে? তা যাকগে, এখন তোমার কাছে পাঠাল মা। তোমাকে কাল একবার যেতে বলেছে।

কেন? কী ব্যাপার?

তা জানি না। বলে পাঠাল, এসে বলে গেলাম, ব্যস! তা আচ্ছা সুবীরদা, বউদির ওই বার্নপুরের মাসি, মানে যিনি মারা গেলেন, নিজের মাসি নয়?

কে বলল?

মা বলল। বলল, বুঝেছি, ওর সেই মন্টিমাসি তো? ওকে আমি খুব চিনি। পাতানো মাসি। আগে পাশের বাড়িতে থাকত?

বউদি কিন্তু উনি মারা যাওয়ায় খুব কাঁদছিল।

এ কথার আর উত্তর কী? 'খুব কাঁদছিল!' ও তো সেন্টিমেন্টালই! সুবীর স্নান করতে ঢুকে গেল।

সারাদিনই মনটা অস্বস্তির মত হয়ে থেকেছিল, যেন দোষী দোষী ভাব। চায়ের টেবিলে এসে সুবীরের সেটাই আবার নতুন করে বেড়ে গেল। সকালে বোধহয় লুনার সঙ্গে ব্যাপারটা ভাল করা হয়নি। সত্যি নিজের আর পাতানোয় তফাত কী? জগতের সব থেকে প্রধান সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই তো 'পাতানো'। বেচারি লুনা। 'খুব কেঁদেছিল' অথচ আমি সেভাবে সান্ত্বনার কথা কিছু বললাম না।

চায়ের সঙ্গে মাছের সিঙাড়া গোছের কী একটা দিল লুনা। অলককে বলল, কী বললি? দুটো তুলে নেব? খুব যে ওস্তাদ হয়েছিস দেখছি। খা বলছি, সব কটা। আমি বরং ভাল লাগলে আরো দেব ভাবছিলাম।

সুবীর একটু ইতস্তত করে বলল, তোমরা খাবে না?

লুনা বলল, 'আমরা মানে টুনি এখন চা টা খাবে নাকি?

ওঃ। খেতে নেই বুঝি?

নেই তা নয়। তা আমার তো সবই ডিম মাংস ঠেকানো।

সুবীরের আবার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'ঠেকানো ছোঁওয়া'? এসব শব্দগুলো লুনা কবে শিখল? নির্ঘাত ওই 'টুনি' নাবুলি' ওর শিক্ষা। লুনার বারোটা বেজে গেল মনে হচ্ছে। ওই মেয়ের সঙ্গ! রাগ চেপে বলল, তা তুমি? তোমারও খাওয়া চলবে না?

লুনা বিরক্ত গলায় বলল, চলাচলি আবার কি! ও একটু ফল মিষ্টি খেয়ে থাকবে, আর আমি মাছের সিঙাড়া নিয়ে খেতে বসব?

সুবীরকে অপ্রতিভ হতেই হল। অন্য প্রসঙ্গে চলে এল। অলককে বলল, কোন কলেজে ভর্তি হবি তুই?

যাদবপুরেই তো ঠিক করে রেখেছিলাম, মারও বাড়ির কাছাকাছি বলে তাই মত। কিন্তু দাদা লিখেছে প্রেসিডেন্সিতে চেষ্টা করতে। করিনি বলে বকেছে।

ধুস! প্রেসিডেন্সি আর আগের মত আছে না কি?

সে কথা তো বলা হয়েছিল। দাদা বলে, যতই হোক, তবু পুরনো গৌরবের মূল্য আলাদা।

লুনা বলল, তোর দাদা দেখছি বেজায় পুরনোপন্থী।

আমি তো তাই বলি, দাদা বলে পুরনো নয়, ঐতিহ্যপন্থী। সব ব্যাপারেই দাদা 'ঐতিহ্য' দেখতে যায়!

ভাল। তো পিসিমা ওর বিয়ের কথা-টথা বলেন না।

নিজের মনে বকবক করে। তোর দাদা ফিরলে তবে তো।

কবে ফিরবে?

এই তো কথাই ছিল সামনের মাসেই আসবে। আবার লিখেছে বোধহয় একটু পিছিয়ে গেল, দু মাসের আগে ছুটি পাবে না। মা-র যা রাগ।

লুনা একটু ব্যঙ্গের গলায় বলল, রাগের কী আছে? অমন সুখের জায়গায় রয়েছে, অত মাইনে। তেলের খনি তো সোনার খনির তুল্য।

তাহলেও দাদা কন্ট্রাক্ট ফুরোলেই ফিরে আসতে চায়। লেখে, শেকড়-ছেঁড়া গাছের মত পড়ে আছি।

কাব্যি! একটা বিয়ে দিয়ে বউ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আর ভারতভূমির মুখোও হতে দেখবে না। বলল লুনা।

অলক হেসে উঠে বলল, মা-ও তাই বলে।

এখন সুবীরের বাড়ির আবহাওয়াটা বেশ হালকা লাগল।

লুনাও তো বেশ সহজভাবেই কথা বলছে।

তবে লক্ষ্য করল না সুবীর, বলছে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে। সুবীরের সঙ্গে নয়।

তা এই রকমই হয় অবশ্য।

কেবলমাত্র দুজনের মধ্যে যখন হঠাৎ একটা মেঘ জমে ওঠে, সেটাকে উড়িয়ে দিতে সাহায্য করে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি।

সুবীর হেসে ফেলে বলল, একজন নবীনা এবং একজন প্রবীনার একই উক্তি? বউ এমনই জিনিস?

অলক বলল, আহা! সবাই যেন তাই। যাক গে তুমি কিন্তু যেও কাল।

লুনা কিন্তু জিগ্যেস করল না, কাল কী রে অলক, এটা লুনার স্বভাবে আশ্চর্য বৈ কি।

সুবীর নিজের ত্রুটির ফুটো রিপু করতেই বোধহয় খানিক পরে বলল, সকালে তো আমি তোমার ওই টুনির সঙ্গে সাহস করে দেখা করতে পারিনি। মনটন এখন খারাপ। তো একবার দেখা না করাটা কি ঠিক হচ্ছে।

সুবীরের এই চেষ্টা করে বলা কথাতেও কিন্তু চিরকেলে সরল লুনার মনটা গলে গেল।

আরে তাই তো। এদিকটা তে, ভাবেনি লুনা। সত্যিই তো একটা অনাত্মীয় প্রায় অচেনা সদ্য মাতৃহারা মেয়ের সঙ্গে ডেকে কথা বলা পুরুষ মানুষের পক্ষে শক্ত বৈ কি। লুনা কিনা এই অস্বস্তিটাকে সুবীরের অবজ্ঞা বা বিরক্তি ভেবে দুঃখ পাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমিও তো তাই ওকে বলেছিলাম, তোর জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দেখা কর। তা বলল, লজ্জা করছে।

লজ্জার কী আছে?

সুবীর পাশের সেই ঘরটার দরজায় এসে দাঁড়াল। যে ঘরটায় টুনিকে প্রতিষ্ঠা করেছে লুনা। এই ঘরে লুনার যত রাজ্যের জিনিসপত্র জমানো। তবে জিনিসগুলো তো এমন কিছু বাজে নয়, দুটো মানুষের ছোট্ট সংসারে বাড়তি আর বাজে জিনিস কতটুকুই বা জমতে পারে? লুনার বিয়ের সময় পাওয়া কিছু কিছু বস্তু তুলে রাখা আছে দেয়াল আলমারির মধ্যে। তাছাড়া বেঞ্চের ওপর গুছিয়ে রাখা আছে লুনার সেলাই কল, রেকর্ড প্লেয়ার, সুবীরের টেপরেকর্ডার এবং লুনার জমানো বাড়তি চায়ের সেট, নতুন স্টেন-লেসের শৌখিন বাসন।

এরই একধারে ছিল একটা সরু খাট। সুবীরের একদা একক জীবনের স্মৃতি। গেস্ট-এর জন্যেই থাকে।

এই ঘরটাকে সুবীর বলে, লুনার সংসারের 'গোডাউন'।

তা বাড়িতে তো তিনটে মাত্র ঘর। তার একটা তো সুবীরের কাজের ঘর। স্টুডিও বলতে লজ্জা পায় সুবীর। তাই বলে, আমার কাজের ঘর।

আর সব থেকে ভাল ঘরটা তো ওদের শোবার ঘর।

জানা কথা। তবু সুবীর দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলবার জন্যেই বলে উঠল, কী লুনা, বন্ধুকে এই গোডাউনে স্থাপিত করেছ ?

টুনি খাটের উপর বসেছিল একটা বই হাতে করে। তাড়াতাড়ি বইটা নামিয়ে রেখে চলে এসে, প্রণাম করবে না কি করবে না গোছের একটা ভঙ্গিতে ইতস্তত করতেই লুনা বলল, এই, না না থাক। এখন প্রণাম করতে নেই।

সুবীর আবার চমকে উঠল, চমৎকৃত হল।

লুনার মধ্যে এসব কোথায় জমানো ছিল ? এই করতে আছে, আর করতে নেই !

সুবীর তো জানত সুবীরের সত্তা আর লুনার সত্তার মধ্যে কোনো বিভাজন রেখা নেই। দুটো একই। সুবীরের জানার জগৎ আর লুনার জানার জগৎ বুঝি একই। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে লুনার একটা আলাদা জগৎ ছিল কোথাও, সুবীর যার সন্ধান জানত না।

সুবীর বলল, থাক। থাক।

টুনি মুখটা একটু নিচু করে দাঁড়াল। তবে একটু হাসলও। কিছুটা অপ্রতিভভাবে।

আর এই লম্বা ছিপছিপে নিটোল মসৃণ মুখের সুন্দরী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সুবীরের মনে হল, বাঃ।

পিসি বলল, হ্যাঁরে সুবো, লুনা বউমা না কি ওর সেই মণ্টিমাসির মেয়েটাকে চিরকালের মত নিয়ে এসেছে।

পিসির কথার সুরেই প্রকাশিত হল, এটা শুধু একটি প্রমাণ মাত্র নয়। এই প্রমাণের জন্যেই সুবীরকে ডাকিয়ে আনানো।

মনে মনে হাসল সুবীর।

বরাবরই পিসির এই অন্যের ব্যাপারে নাকগলানো স্বভাব। যার জন্যে সুবীরের মা বলতেন, তোর পিসিটি স্রেফ 'পর্দিপিসি'।

সুবীর বলল, এনেছে তো! চিরকালের কথা চিরকালই জানে।

আহা অনেকে তো উপস্থিত ছিল সেখানে। তিনি নাকি লুনাকে দেখে কেঁদে উঠে বললেন, মরতে তো আমার দুঃখ নেই লুনা। শুধু মেয়েটার জন্যেই, মরেও সুখ পাচ্ছি না। তখন লুনা বউমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওর জন্যে ভেব না মাসি, ওর ভার আমার। সেই রাত্তিরেই তো মারা গেল বুড়ি।

সুবীর হেসে বলল, বুড়ি নাকি ?

ওই হল। মেয়েমানুষ বিধবা হলেই বুড়ি। তা এটা কি বউমার বেশ বুদ্ধির কাজ হয়েছে ?

সুবীর অবশ্য পিসির সঙ্গে একমত। তবু সুবীর সেটা প্রকাশ করতে তো পারে না। তাই হেসে বলে, তোমার ওই বউমাটিকে কি খুব বুদ্ধিমতী বলে মনে হত তোমার ?

তাহলেও কাণ্ডজ্ঞান বলে থাকবে তো কিছু। তোদের এই দুজনের সংসারে—তায় কি একটা বাচ্চা মেয়ে। ওই মেয়ের বিয়ের দায়দায়িত্বটাও তো তোর ঘাড়ে পড়ল।

বিয়ে! সুবীরের শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

সুবীর যেন ঘন অন্ধকারে এক চিলতে আলো দেখতে পেল। বাঃ এই তো একটা সুন্দর সমাধান রয়েছে। এটা তো মনে আসেনি সুবীরের। কাল থেকে কেবলই ভেবে মরেছে, তার সব সুখ-স্বস্তি-স্বাধীনতা চিরকালের মত খতম হয়ে গেল।

বলল, এতদূর পর্যন্ত ভেবে ফেলেছ পিসি ?

তা ভাবব না ? পৃথিবীতে কমদিন করে খাচ্ছি। তা দেখতে কেমন ?

সুবীর দুদিক বাঁচিয়ে বলল, ভালই তো।

পিসি বলল, অলক তো বলছে খুব সুন্দর।

বলেছে বুঝি ? অত দেখিনি।

পিসি মনে মনে বলল, দেখনি, সেটা ভাল। তবে রাতদিন চোখের সামনে ঘুরবে আর না দেখে থাকবে ? নিবুদ্ধির ঢেঁকি বউটা, খাল কেটে কুমির আনল।

মুখে বলল, কী জাত ?

সুবীর আকাশ থেকে পড়ল। কী জাত মানে!

জাত কথাটার মানে জানিস না ?

কী আশ্চর্য! বাঙালিই তো।

পিসি রেগে বলল, নাঃ, চিরটাকাল একরকমই রইলি ! বাঙালি না তো কি মাদ্রাজি মাড়োয়ারি বলছি ? থাক তোকে আর বলতে হবে না ।

'খুব সুন্দর' এই শব্দটি শুনে পর্যন্ত পিসি যে মনে মনে এক ভবিষ্যৎ বাসার ভিত গাঁথতে বসছিলেন তা তো আর এক্ষুনি বলতে পারেন না ।

সুবীর এখন অভীকের কথা পাড়ল । বলল, ক'বছরের কণ্ট্রাক্ট অভীকের ?

বলেছিল তো পাঁচ বছর, গড়িয়ে গড়িয়ে তো সাড়ে পাঁচ হয়েই গেল ।

আবার ফিরে যাবে ?

লেখে তো কলকাতার জন্যে প্রাণ কাঁদছে । কবে কলকাতায় ফিরব । তা কলকাতায় ফিরে অত টাকা মাইনের চাকরিটি পাবে ? হন্যে হয়ে দু দশদিন ঘুরে আবার হয়তো ফিরেই যাবে ।

পিসি যে অনেকদিন পৃথিবীতে চরছেন তা বোঝা যাচ্ছে ।

সুবীর বলল, ও পিসি তোমার লুনা আসার সময় বলে দিল, তোমাদের পুরুত মশাইকে একবার দরকার । আছে তোমার পুরুত-টুরুত ?

ওমা ! শোনো কথা । পুরুত থাকবে না । কেন তো মেলেচ্ছ বাড়িতে হঠাৎ পুরুতের কী দরকার পড়ল ? বলেই বলল, ওঃ বুঝেছি ।

কী বুঝলে ?

ওই মেয়েটা তো সদ্য মা মরার পর এসেছে, শুদ্ধু হতে হবে তো ! আচ্ছা আমি কাল যাব তোর ওখানে । কীভাবে কী করবে জেনে নিয়ে বলে পাঠাব পুরুতকে ।

সুবীর বলল, আচ্ছা পিসি, মা-বাবা মারা গেলে মানুষ হঠাৎ পতিত হয়ে যায় কেন বল তো ? শুদ্ধু না কি হতে হবে বললে ।

কেন, কী বিত্তান্ত তা জানি না বাবা । জন্ম-মৃত্যু দুয়েতেই অশৌচ । মৃত্যুর জন্যে তবু একটা মানে পাওয়া যায় । ধর মৃত্যু মানেই তো একটা অসুখ-বিসুখ । বাড়িতে তার ইনফেকশান-মিনফেকশান থাকে দশ-বিশ দিন, আর পাঁচজনের, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা খাওয়া-দাওয়া না করাই ভাল । কিন্তু জন্ময় যে কী হয় কে জানে !

সুবীর বলে, জান না, তবু মানতেও তো ছাড় না ।

কী করব বল, চিরকাল যা করে আসছে সবাই তাই করে-মরছি ।

ওই তো । মানে বোঝবার চেষ্টা নেই শুধু চিরকাল সবাই করে আসছে, অতএব করতে হবে । নাঃ তোমাদের আর উদ্ধার নেই ।

পিসি হেসে উঠে বলে, তা আমায় বলছিস কেন বাবা। তোরা একেলেরা, তোরাই বা ছাড়তে পারছিস কোথায় ? এই তো পুরুত খুঁজছিস।

আমি মোটেই নয়।

তুই নয়, তোর বউ! সে তো আরও পাঁচ-সাত বছরের ছোট রে বাবা। আসলে মুখে যে যতই বারফট্টাই করিস বাবা, ভেতরে সেই সংস্কারের বাঁধন। এই যে আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, ছোট থেকে পুজোপাঠ আচার-নিয়ম সবকিছুকে বলত 'বোগাস', ঠাকুর দেখতে গিয়েও একটু নমস্কার করত না। যদি বলা হয়েছে, তবে পুজো প্যাণ্ডেলে যাস কেন। বলত যাই আর্ট দেখতে। তো সেই ছেলেই বাপ মরতে পুরোদস্তুর নিয়ম মেনে হবিষ্যির আচার-বিচার সব মেনে ন্যাড়া হয়ে বাপের কাজ করতে বসল। বোঝ! অভীক বলেছিল শানুদা, তুমি তো কিছু মান না, তবে এসব করছ কেন ? তো একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবা তো মানতেন! এইভাবেই সংস্কারের ধারা বয়ে আসছে। তা যাক ওকথা, লুনা বউমাকে ভাবতে বারণ করে দিস, আমি সব দেখেশুনে করিয়ে দেব।

একজন পুরুত, একজন গিন্নি, আর অবারিত কিছু টাকা, এই তিনের মহামিলনে যে কোনো নিয়মনীতি করণ-কারণের কাজ অবলীলায় হয়ে যায়। টুনি নামের মেয়েটার মাতৃশ্রাদ্ধ যে এমন সুশৃঙ্খল শাস্ত্রীয় ভাবে সাঙ্গ হতে পারবে তা কি তার সেই দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া বিধবা মা মণ্টি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ?

সব কাজের শেষ হতে প্রায় বিকেলই হয়ে গেল টুনির।

লুনা ওকে জোর করে কিছু খাইয়ে নিজে অন্য সব কাজ সারতে গেছে। টুনি চুপ করে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল গ্রীল ধরে।

সুবীর ফিরল। অন্যদিনের থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে।

সুবীর লুনার সন্ধানে এসে টুনিকে দেখতে পেল। আর হঠাৎ যেন চমকেই গেল। যেন টুনিকে এই প্রথম দেখল সুবীর। টুনির ঈষৎ পাণ্ডুর ম্লান বিষণ্ণ মুখ, পিঠে ছড়িয়ে থাকা এতদিনের তৈলহীন রুক্ষ চুলের রাশ, পরনে একখানা চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি, আর হতাশগভীর দৃষ্টি, যে এমন একটা অলৌকিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, তা বুঝি আগে কখনো জানা ছিল না সুবীরের।

টুনি টের পাচ্ছিল না। কেউ তার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে। সে বাতাসে উড়ে উড়ে মুখচোখে পড়া চুলগুলোকে একেবারে ঠেলে কপালের ওপর সরিয়ে দিল।

আর সেই সময়ই সুবীর এগিয়ে এসে প্রায় খাপছাড়া ভাবেই বলে ফেলল খুব খারাপ লাগছে আজকের দিনটা ছুটি না নিতে পারায়। লুনা বলেছিল—

এটা অবশ্য একটু অন্য ভাষায় বলা। লুনা মান খুইয়ে একথা বলেনি, তুমি ওইদিন ছুটি নিও। সে শুধু বলেছিল, তোমাকে তো আর বলা যাবে না ওদিন একটু ছুটি নিও। অলকটা রয়েছে এই যা সুবিধে।

যাক ভাষাতে কী আসে যায়।

সুবীর তো নিজের কুণ্ঠাটা বোঝাতে পারল।

কিন্তু সুবীর যদি এই মুহূর্তে একটি অলৌকিক সৌন্দর্যের দেখা না পেত, কুণ্ঠার সঙ্গে কী এমন আন্তরিকতা ফুটত? এমনভাবে সরাসরি ভেবে কথাই বা এই কদিনের মধ্যে কবে বলেছে?

টুনি তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে এল। আস্তে বলল, লুনাদি তো কত করছে। অলকও ছিল। পিসিমা তো ছিলেনই সেই সকাল থেকে।

সুবীর আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে ধাঁ করে একটা বোকার মত কথা বলে বসল। বলল, আপনার চুলটা কী অদ্ভুত সুন্দর। কোনো দামী শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে হলে আইডিয়াল। বলে ফেলেই মরমে মরল।

টুনি একটু হেসে ফেলল। বলল, বোঝা গেল, পেশাটা আপনার নেশা হয়ে গেছে।

সুবীর ভাবল, আশ্চর্য! আমি এর সঙ্গে কোনদিন ভেবে কথা বলিনি। ভাবতাম বোধহয় বোকা বোকা মুখ করা একটা গেঁয়ো মেয়ে। যে ভাবে লুনা কাচা কাপড় আর আচার-বিচার শুরু করেছিল ওকে নিয়ে।

এখন উৎসাহ পেল। বলল, ওঃ, আমার পেশা-টেশার খবর হয়ে গেছে?

জানা হবে না? বাঃ।

তা বটে। অপনার লুনাদির গল্পের বিষয়বস্তুর বেশির ভাগটাই বোধ হয় পতিনিন্দা।

লুনাদি অমন মেয়ে?

এক-একটি ব্যাপারে সব মেয়েই একরকম।

টুনির সেই ঈষৎ পাণ্ডুর মুখ। সেই হতাশা গম্ভীর দৃষ্টিতে যেমন একটা অপার্থিব ভাব ফুটে উঠেছিল তেমনি আবার টুনির মুখে এখন যে ভাব ফুটে উঠল, একটু কৌতুকে রক্তিম আভায় তাও অপূর্ব।

টুনি কৌতুকের হাসিতে মুড়ে বলল, কথাটা নিন্দা মোটেই না। তবে পতির প্রসঙ্গ বটে। সারাক্ষণ তো কেবলই আপনার কথা।

সুবীরকে যেন কথার নেশায় পেল। যে সুবীর এই কদিন কেমন পাশ কাটিয়ে বেড়িয়েছে পাছে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়, এখন সেই আবার কথার পিঠে কথা সাজাচ্ছে। বলল, তাই না কি? অর্থাৎ বলতে চান, সেসব কথা নিছক প্রশংসাবাক্য।

সুবীর বলল, জানা থাকল।

এইসময় লুনা এল। বলে উঠল, তুমি এসেছ। আর আমি এতক্ষণ অলকের কাছে তোমার আক্কেলের মুণ্ডুপাত করছিলাম।

করছিলে তো? হা হা করে হেসে ওঠে সুবীর। টুনির দিকে তাকিয়ে।

লুনা একটু চকিত হল। সুবীরের পক্ষে এটা কি বেশ স্বাভাবিক! বলল, কী হল?

ওঁর একটা ভুল ধারণার নিরসন হল। যার ফলে আমার জিত।

লুনা কথাটা ঠিক ধরতে না পারলেও, বুঝল সুবীর টুনির সঙ্গে সহজভাবে একটু কথা বলাবলি করেছে। লুনা বাঁচল। লুনার কাছে সংসারের এই সাম্প্রতিক পরিস্থিতিটা বড় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

সুবীরের ওই সর্বদা পাশ কাটিয়ে যাওয়া ভাব বেচারি লুনাকে কি কম আহত করেছিল। অথচ টুনিকে একপাশে ফেলে রেখে, সুবীরের কাছাকাছি পেঁছে গিয়ে মাঝখানের এই অদৃশ্য দেয়ালটাকে ভেঙে ফেলতেও পারছিল না।

লুনার একমাত্র আশা ছিল টুনিকে যেদিন তাদের সঙ্গে এক টেবিলে নিয়ে খেতে বসতে পারবে, সেদিন থেকে নিশ্চয়ই পরিস্থিতিটা কিছুটা সহজ হয়ে আসতে থাকবে। একত্রে বসে খাওয়া, এটা পরিচয় গাঢ় হওয়ার একটা উপায় নিশ্চয়ই। তাছাড়া—

আরো একটা কারণে লুনার ভিতরে ভয়ানক একটা ব্যাকুলতা আসছিল।

এই এতগুলো দিন লুনা ঘরছাড়া। লুনার এই কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনে এমন ঘটনা কবে ঘটেছে ?

যদিও টুনি ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেছিল, একা শুতে খুব পারবে সে, হলেও অন্য জায়গা অন্য পরিবেশ, কিন্তু লুনা আপন ভব্যতায় সে কথা নাকচ করে দিয়েছিল। এবং ভেবেচিন্তে আপতত হিসেবে বলেছিল, মা-বাবা তো মহাগুরু, তা বিয়োগের সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়রে টুনি। অন্তত কাজটা হওয়া পর্যন্ত রাত্রে একা থাকা চলবে না। আমি থাকব তোর কাছে।

আজ সেই কাজটা মিটে গেছে।

লুনা একটা মুক্তির আশায় ভিতরে ভিতরে স্পন্দিত হচ্ছিল। অথচ দারুণ একটা লজ্জা মনটাকে মুঠোয় চেপে ধরছে, কীভাবে হঠাৎ আবার এই ব্যবস্থাটির বদল ঘটিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। টুনি হয়তো নিজে থেকেই বলবে, কারণ টুনি প্রায় রোজই একবার করে কথাটা তুলেছে। নিজের ঘর ছেড়ে শুতে হচ্ছে লুনাকে, কত অসুবিধে।

কিন্তু লুনা কী করে ও ঘরে গিয়ে ঢুকবে ? বোকার মত ? অযাচিতের মত ? ভিখিরীর মত ?

হঠাৎ কেনই বা তা ভাবছে লুনা ? সুবীর তো তাকে বর্জন করেনি। বরং 'বর্জন' শব্দটা ব্যবহার করতে খারাপ লাগলেও, বলতে হয়, লুনাই, পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাই করে নিল। তা সুবীর কি সেটা বোঝেনি ? হয়তো বুঝেও ছিল, কিন্তু সুবীরের দিক থেকে কোনো ব্যাকুলতা ছিল কি ? সুবীর কি এই বিরহ-যন্ত্রণা নিয়ে হা-হুতাশ করেছিল ?

লুনার মধ্যেকার সমস্যাটি এইখানে। সুবীর যদি আড়ালে-আবডালে একবারও বলত, আর তো পারা যাচ্ছে না লুনা! রাত্রে শুতে গিয়ে মরুভূমির মত বিছানাটাকে দেখে পালিয়ে ফুটপাতে গিয়ে শুতে ইচ্ছে করে।

এই ধরনেরই তো কথাবার্তা সুবীরের। কিন্তু সুবীর তার নিজস্ব ভঙ্গিটা হারিয়ে ফেলেছে এই কদিন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সুবীর টুনিকেই 'যত যন্ত্রণার গোড়া' ভেবে ওর ওপর বিরূপতার বশে লুনাকেও এড়িয়ে চলেছে।

এখন লুনার আবার বরের ঘরে, অথবা নিজের ঘরে শুতে যেতে কী অদ্ভুত একটা অস্বস্তি। যেন পায়ের তলায় মাটি নেই।

হঠাৎ সুবীরের ওই নিজস্ব ভঙ্গিতে গলা খুলে হেসে ওঠা দেখে লুনা

যেন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পেল। আর তখুনি লুনার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের যবনিকা সরে গেল। ভাবল, ইস! আমি কী বোকা? বিরহযন্ত্রণায় আকুল হয়ে ও আক্ষেপ জানাতে আসবে কী করে? এ ভয়ও তো থাকতে পারে, আমি বলে উঠব, উঃ তুমি কী গো? একটা শোকতাপ পাওয়ার মেয়েকে একটু স্নেহচ্ছায়ায় আগলে রেখেছি, সেটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারছ না তুমি? অথবা যদি বলেই বসি, উঃ! কী হ্যাংলা! পুরুষের একটা মান নেই?

এখন মনে হল লুনার, বোধহয় সব সহজ হয়ে যাবে এবার। সব সহজ, স্বাভাবিক, আগের মত।

সুবীরের পিসির মনটায় আশা আর হতাশার জোয়ারভাটা। টুনিকে দেখেই যেমন তার মনের মধ্যে একটা বাসনা উদ্বেল হয়ে উঠল, তেমনি আবার সেই উদ্বেলিত বাসনাই ঝিমিয়ে পড়ল উথলে ওঠা দুধে এক আছড়া জলের মত। মেয়েটা বামুন।

তবে কী করে একদা এই মেয়ের বাড়ি আর লুনাদের বাড়ির মধ্যে এত গলাগলি, এত মাখামাখি, দু বাড়ির রান্নাঘরের অবদানের আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল? বামুন কায়স্তের মধ্যে এতও হয়?

আবার ভাবল ভাব-ভালবাসায় কী না হয়! তা বলে বিয়ের ব্যাপারে রাজি হবে কী?

কিন্তু কেই বা আছে ও মেয়ের লুনার কাছে আঁচে-ইঙ্গিতে জানলেন বটে। কলকাতারই কোনখানে যেন টুনির বাবার ভাই এবং ভাইপো কারা নাকি আছে। কিন্তু টুনির মার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া সত্বেও তো একবার দেখা করতে আসেনি? একটা চিঠি দিয়ে তো খোঁজ নেয়নি! তারা কি আর স্বজাত-অন্যজাত বলে আপত্তি তুলতে আসবে? তা তেমন হলে তো লুনা বউমা বলতে পারবে, তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? যখন ও বেচারির মা চলে গেলেন। একটা তো খোজও নেননি।

পিসি ঝুনো লোক, বুঝতেই পারছে তখন খোঁজ নিতে হলে যে বিপাকে পড়ে যেতে হতে পারে, এ জ্ঞান আছে তাদের। সবাই লুনা বউমার মত হ্যাবলা নয়।

আবার ভাবছিল, ওদিক থেকে বাধা-টাধা না এলেও, তার নিজের আত্মজনই বা কী বলবে ? বলতেই তো পারে, কী গো তোমার অমন হীরের টুকরো ছেলের জন্যে, স্বঘরে একটা ভাল মা-বাপ-থাকা মানুষের মত ঘরের মেয়ে খুঁজে পেলে না ? ও ছেলের কত পাওনা-থোওনা হবার কথা। সোন্দর মেয়ে কি নেই নিজেদের ঘরের মধ্যে ?

এই দোটানা মনোভাবই সুবীরের পিসি প্রমীলাকে বেশ চঞ্চল করছে ?

তবু সারাদিন পুরোহিতের কাজের যোগাড় দিতে দিতে নড়তে চড়তে কেবলই মেয়েটার দিকে বিভোর হয়ে হয়ে তাকিয়ে থেকেছে প্রমীলা, আর মুগ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র পুরুষই যে নারী-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়, মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকে তা নয়। রমণীও রমণীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট আর মোহিত হয় বৈকি। যদি আবাব এই প্রথমা রমণী কোনো বিবাহযোগ্য পুত্রের জননী হন।

যদিও এইসব জননীদের হৃদয় রহস্য বোঝা ভার।

এ রা রাজ্য চুঁড়ে রূপসী কন্যা খুঁজে এনে ছেলের বিয়ে দেন, কিন্তু বিয়ের পর যেই দেখল ছেলে পত্নীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছে, ব্যস! বিরক্তিতে বিষ। সামলোচনায় মুখর।

তবু আবার পরবর্তী পুত্রের জন্য, (যদি থাকে) কোথাও কোনখানে একটি লাবণ্যময়ী কিশোরী দেখতে পেলেই সংবান নিতে বসেন, সে মেয়ে 'কী জাত কী নাম ধরে, কোথায় বসতি করে—'

ভারী সহজ হয়ে গেল এক টেবিলে খেতে বসে।

সুবীর বলতে লাগল, এই রেটে খেয়ে আপনি এখনো পৃথিবীতে চরে বেড়াচ্ছেন কী করে ?

লনা বলল, ওকে আর 'আপনি' করে বলার কী আছে গো ? আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। ওর জাঙিয়ার গিঁট পড়ে গেলেই আমার কাছে ছুটে আসত, লনাদি 'গিঁত লেগে গেতে'—কী রে মনে পড়ে ?

সুবীর বাঁ হাতে টেবিল চাপড়ে বলে, অবজেকশন, অবজেকশন! একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন।

লনা বলল, আহা, তখন যেন একজন ভদ্রমহিলা ছিল ?

এখন তো হয়েছেন ?

টুনি হেসে বলল, আমার কিন্তু খুব মনে আছে। প্রথমে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার হবার আশায় প্রাণপণ টানাটানি করে আরো কষে গিঁট পরাতাম, তারপর কাতর হয়ে লনাদির শরণ নিতে আসতাম।

তবে ? লনা হেসে ওঠে। তবে আবার 'আপনি' কী ? 'তুমি' বুঝলে মশাই !

সুবীর বলল, চেষ্টা করব। তারপর বলল, আজ কিন্তু আমি তখন ওঁর খোলা চুল দেখে বলে ফেলেছিলাম—

কী থামলে যে ? বলেই ফেল। কী বলেছিলে, রক্ষাকালী ?

ধেত। বলেছিলাম, শ্যাম্পুর অ্যাডভার্টিজমেণ্টে আইডিয়াল মডেল।

ওমা ! এই কথা বলেছ ? সাধে বলে, 'চোরের মন ভাঙা বেড়ায় !' অমনি নিজের কাজটির কথা মনে পড়ে গেল ?

নাঃ। তোমার প্রকাশভঙ্গিটা বড় যাচ্ছেতাই রকমের গ্রাম্য হয়ে গেল। তোমার টুনি বলেছিলেন, আপনার দেখছি পেশাটাই নেশা হয়ে গেছে।

ঠিকই বলেছে। যাক এখন থেকে টুনি তোমার পেশায় সহায়ক হবে। জানিস তো টুনি (অর্থাৎ জানানো হয়েই গেছে) ওর জ্বালায় এক একসময় আমার সংসারের কাজ মাথায় ওঠে। যখন-তখন ওর সামনে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।—এই তুমি, এইবার হাতের কাছে একটি 'কেশবতী কন্যা' 'হরিণনয়নাও' পেয়ে যাচ্ছ ! আর আমায় ডিসটার্ব করতে আসবে না।

তার মানে লনা নামের নির্বোধ মেয়েটা, শুধু খাল কেটেই নিরস্ত হয়নি, খিড়কির দরজা খুলে কুমীরকে বাড়ির উঠোনে এনে ঢোকালো।

টুনি বলল, এই লনাদি, কী হচ্ছে ? আবার আমার পাতে মাছ চাপাতে আসছ ? একদম না। অসম্ভব।

লনা বলতে যাচ্ছিল' বাঃ তুই কতদিন নিরিমিষ খেয়ে সারা হয়েছিস, সামলে নিল। কার্যকারণ ভাবল। তাড়াতাড়ি বলল, বাঃ তিন রকম মাছ রান্না হয়েছে তো। তোকে দেব না ?

তিন রকমটা তোমারই কীর্তি'। বাজারে গিয়ে যত ইচ্ছে—

লনা বরের দিকে একটি কটাক্ষ হেনে বলল, এই ভালমানুষ লোকটি

এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অথচ তবু একরকম মাছ দিয়ে ভাত খাবার কথা ভাবতেই পারে না।

সুবীর খুব ভালমানুষের মত বলল, মুরগি কি মাংস থাকলে পারি না?

ওই শোন কথা। হি হি করে হেসে উঠে লুনা।

আজ তার মনের মধ্যে বসন্তের হাওয়া বইছে। লোককে ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে, দেখ আমার বরটি কেমন সুন্দর মনোমুগ্ধকারী। কথায় কেমন জৌলুস আনতে জানে।

এই কদিন টুনির কাছে বরের ব্যাপারে বেশ একটু মুখছোপ খেয়েই ছিল। লুনা কেবলই ভাবছিল, সুবীর যে কেন এমন ব্যবহার করছে। টুনি ভাবছে, লুনাদির বরটা বুঝি এই রকমই। এখন দেখুক।

আর সুবীর?

প্রথমদিন টেবিলে দুটো থালার বদলে একটা থালা দেখে ভেবেছিল। আমার সব গেল। চিরকালের মতই গেল। আজ মনে হচ্ছে। এতদিন খাবার টেবিলটা কী নিষ্প্রভই লাগত। দেখা যাচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে আলো জ্বলে।

রাত্রে লুনা আর একবার বলল, এই টুনি, তুই যে আমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস একা ভয় পাবি না তো?

তোমার কথা শুনে মনে হয় লুনাদি তোমার বাড়িতে বোধহয় ভূত কিলবিল করছে।

হেসে ওঠে লুনা। হাসতে হাসতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, আসামী হাজির। এখন কী শাস্তিবিধান হয় বলুন স্যার।

প্রমীলা বলল, তোর ব্যাপারটা কী রে অলক? আবার আজ তোর সুবোর বাড়ি নেমতন্ন? নিত্যি এত নেমতন্নর ঘটা কিসের?

অলক হেসে হেসে বলে, ঘটার কারণ লুনাদির নতুন নতুন রান্নার এক্স-পেরিমেন্ট। ওই টুনিদির মা নাকি অনেক সব রান্না জানতেন, মেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্যে সেই সব রন্ধনপ্রণালী লিখে লিখে রাখতেন। লুনাদি

সেই খাতাটা আবিষ্কার করে ফেলে এনতার চালিয়ে যাচ্ছেন। আর বাইরের কাউকে না খাওয়ালে নাকি পাশ ফেল বোঝা যাবে না।

মা বলল, তো ওই তোর টুনিদি কেমন মেয়ে?

ওরে বাবা! কী ভাল! কী ভাল! বলেছি তো তোমায়, এমন ভাল মেয়ে তুমি কোথাও দেখবে না।

অলকের চোখমুখে উৎসাহের দীপ্তি।

এই বয়েসে, বয়েসে কিছু বড় কোনো সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে আসতে পেলে ছেলেগুলো একেবারে মোহিত হয়ে যায়। এও একরকম প্রেমই। মুগ্ধতা!

প্রমীলা তার ছোটছেলের এই আলোজ্বলা মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার বড় ছেলের কথা মনে করল। ভাবল, তা বামুন বৈ তো হাড়িডোম নয়, ভাবনার কী আছে। তারপর বলল ওরে 'সুবীরদাকে' বলে দিস তাহলে তোর দাদার চিঠি এসেছে। সামনের মাসের দোসরা আসছে।

বাড়িটা ছিল পাখির নীড়ের মত। শুধু দুটি প্রাণীর কূজন-গুঞ্জন, শুধু পৃথিবীকে ভুলে নিজেদের নিয়ে থাকা।

বদলে গেল ধারা।

এখন যেন নিত্যই উৎসব। যেন পাখিরা নীড় ছেড়ে আকাশে ডানা মেলেছে। অলকনামের সদ্য কলেজে ঢোকা ছেলেটাও এদের এই মজলিশের একটা বড় অংশীদার।

সুবীরের সে সুখটা অবশ্য গেছে। যখন তখন লুনাকে জড়িয়ে ধরা, যখন তখন কাছে বসিয়ে রেখে স্কেচ করা। কিন্তু এমন কিছু অভাব বোধ হচ্ছে না তার জন্যে সুবীর সামন্তর। প্রথমটার জন্যে তো রাত্রিই রয়েছে। আর দ্বিতীয়টার জন্যে রয়েছে টুনি।

হ্যাঁ টুনিকেই এখন যখন তখন ডাকাডাকি।

এই যে ও শ্রীমতী টুনি। এদিকে একবার চলে আসুন প্লিজ।

সকালবেলাটা লুনার রান্নার কাছাকাছিই থাকে টুনি। হয়তো কুটনোটা কুটে দেয়, হয়তো চা-টা তৈরি করে। বলে, সকালবেলাটা এই রান্না-ভাঁড়ারের দিকটা ছেড়ে অন্য কোথাও মন বসে না লুনাদি। বরাবর মায়ের

সঙ্গে তাই থেকেছি তো। মা অবশ্য বলত, যা তুই তোর লেখাপড়া করগে যা। যা তুই এইসময় না হয় বোনাটা নিয়ে বসগে যা। মন বসত না।

লুনোও বলে, আমার খিদমদগারি করতে তো বৃন্দাই রয়েছে রে। তুই বরং না হয় সেলাই-টেলাই কর।

টুনি বলে, সকালে ওসব কাজে মন বসে না লুনাদি।

অতএব রান্নাঘরের ধারেকাছেই থাকে। তবে কতক্ষণই বা।

সুবীর কখনো শ্রীমতী টুনিকে সরাসরিই ডাক দেয়। কখনো বা জোর গলায় ডাক পাড়ে, এই তোমাদের বাড়িতে কি আজ লোকজন খাবে? দুজনে মিলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে বসে আছ যে। একজন চলে আসতে পারবে না?

সত্যিই কি আর সুবীরের ওদের বিহনে কাজ হয় না? তা অবশ্যই নয়। এই ওর লীলা।

তবে হ্যাঁ, আজকাল অনেক অর্ডার বেড়েছে। এখন আবার বাংলা পত্র-পত্রিকায় সেই পূর্বকালের মত গল্প উপন্যাসে ছবির সমারোহ। বড়দের পত্রিকা থেকে উঠে গিয়েছিল এটা। তা এই সব ঘটনা আর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ছবি আঁকতে নানা ভঙ্গির জন্য কিছুটা সাহায্যর দরকার হয়। আর দরকারটা তো নারীদেহের ভাঁজ-খাঁজ আর নমনীয়তা-কমনীয়তার নিখুঁতত্বের জন্যে। তবে প্রধানত বিজ্ঞাপনের কাজের জন্যে।

টুনির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল লুনা। বলল, নাও, এখন লুনাদির সাহায্য ছেড়ে লুনাদির বরকে সাহায্য করগে যা! চটপট যা। নইলে আবার চেঁচাবে।

টুনিকে চলে আসতে হয়।

এই শোনো, শিগগির কুইক।

আজও টুনির চুল শ্যাম্পু করা।

আজকাল এটা ঘনঘন করছে টুনি। যেটা আগে ন মাসে ছ মাসে করত। এটা কি এ বাড়ির আবহাওয়ায়, না দামী দামী 'শ্যাম্পু' উপহার পাওয়ায় লুনাদির কাছ থেকে।

বাপের মৃত্যুর পর দীর্ঘ তিনটি বছর রোগগ্রস্ত মা আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে দিন কেটেছে। টুনির জীবন থেকে সব থেকে ভাল সময়ের তিন তিনটে বছর বরবাদ হয়ে গেছে।

এখন এদের এই হাসিখুশি উল্লাসের বাড়িতে এসে টুনি যেন ক্রমশই পল্লবিত হয়ে উঠছে।

যদিও টুনি বোঝে এই জীবনটারও কোনো ভবিষ্যৎ নেই, নেই কোনো স্থায়িত্ব। তবু পালকের মত হালকা দিন-রাত্রিগুলো যেন উঠে চলে যাচ্ছে কোথা দিয়ে।

তাছাড়া রক্তমাংসের শরীর জিনিসটা বড় নির্লজ্জ। ভাল খাওয়া-দাওয়া, দায়িত্বহীন বিশ্রামের সুখ আর সর্বদা একটা হাশিখুশির আবহাওয়া। এই ত্রিশক্তি সম্মেলনে টুনির দেহটাকে রসে লাবণ্যে পুষ্ট করে ছাড়ছে। 'মাতৃশোকের' চিহ্নটা রাখতে দিচ্ছে না।

শিগগির। চটপট! কুইক।

টুনি হেসে ফেলে বলল, আসল ব্যাপাটা কী?

এই যে আপনার ওই চুলের একটা গোছা সামনে এনে ফেলে, একটা আঙুলে জড়ান তো!....না না অত কম চুল না। বেশ অনেকগলো। আপনার তো বাবা অভাব নেই, অনেকগুলো সামনে এনে হাজির করে ফেললেও, পিঠের ওপর ছেয়ে থাকতে অনেকগুলো থাকবে। বাস্তবিক মার্ভেলাস চুল আপনার। একটু ছুঁয়ে না দেখে পারছি না।

সুবীর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টুনির চুলে একটু হাত বুলিয়ে বলে, একেই বলে রেশম-কোমল, তাই না?

টুনির মুখটা লাল দেখায়। তবু উত্তর দেয়। বলে, সে আপনিই জানেন। কথাটা এইমাত্রই শুনলাম। আগে কখনো শুনিনি।

সুবীর একটু তাকিয়ে দেখে বলল, সত্যি আশ্চর্য।

তারপর বলল, এইবার এই বারান্দার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ুন তো। না বারান্দাটাকে আমার দরকার নেই। আঁকছিও না। শুধু অ্যাটমোস-ফিয়ারটা আনতে ভাবটা হবে গভীর অন্যমনস্ক, একদম আকাশে হারিয়ে যাওয়ার দৃষ্টি। আর হাতে একটা কাজের অসমাপ্ত ভঙ্গি। আচ্ছা, ক্যাপশনটা বলে দিলে বুঝতে পারবেন।

টেবিলের কাগজপত্র থেকে হাতড়ে একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে দেখে বলে উঠল, এই যে—

'দিগন্তের অন্তহীন কূলে—

যক্ষবধূ চেয়ে থাকে, সীমন্তে সিন্দুর দিতে ভুলে।'

টুনি একটু সন্দেহের গলায় বলে, আপনার নিজের লেখা।

সুবীর হাতের পেন্সিলটা কপালে ঠেকিয়ে বলে, কেন? শুনে কি দাড়িওয়ালা বুড়ো ভদ্দরলোকের বলে মনে হচ্ছে না?

টুনি তেমনি গলায় বলে, কই মনে পড়েছে না তো মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।

সবই পড়ে শেষ করে মুখস্থ করে রেখেছেন?

—ইস। তাই বলছি না কি? এমনি,-মনে হল যেন নতুন নতুন।

মনে হওয়াটা ভুল হয় নি। জোর করেই, মানে বলতে গেলে গায়ের জোরেই এইটাকে দাঁড় করিয়েছি। উঃ বুড়ো ভদ্দরলোক যে কী কাণ্ডই করে গেছেন। হাজার বছরের মত ফসল তুলে গোলা ভর্তি করে রেখে গেছেন। গোলার দরজা খোলো আর খাও। আর কারুর কিছু করার জন্যে রেখে যাননি।

তা বেশ বুঝলাম আপনারই লেখা। কিন্তু উপলক্ষটা কী? শ্যাম্পু না কেশতৈল, না কি সিঁদুর-ই?

আরে ধরেছ তো ঠিক। ওই সিঁদুরই।

সিঁদুর আর কী এমন বড় ব্যবসা যে তার জন্যে এত খরচা করে বিজ্ঞাপন?

ওহে মহিলা, কোন ব্যবসাটি যে 'কী', তার কোন ধারণাই নেই তোমার। জান—শহরে রোজ কত টাকার শুধু সিঁদুরই বিক্রি হয়?

জানি না অবশ্য।

টুনি হেসে ফেলে বলে, কিন্তু এতে তো সেই সিঁদুরকেই পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না। লিখেছেন—'সীমন্তে সিন্দুর দিতে ভুলে—'

ওটাই তো বিজ্ঞাপনের আর্ট। চট করে ধরা পড়বে না কাকে প্রাধান্য দিচ্ছ।

সুবীর কথা বলছিল, তার সঙ্গে পেন্সিলটাও চালিয়ে যাচ্ছিল একটু একটু। বলল, চোখটা আকাশে ফেরাও। একদম নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু।

একটু পরে ছুটি হল টুনির।

সুবীর একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোমার চোখদুটোও যে কী আশ্চর্য। এই মর্ত্যভূমিতে রয়েছে, এই স্বর্গলোকে হারিয়ে গেছে। সুর্মার অ্যাডভার্টিজমেন্টে কাজে লাগাতে পারলে—

টুনি একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আপনি কি শুধু আপনার ওই অ্যাডভার্টিজমেন্টের চশমা দিয়েই মানুষকে দেখেন ?

হয়ত তাই। ওই যে বলেছিলে পেশাটা নেশা হয়ে গেছে। যেমন এখন মনে হচ্ছে তোমার যা হালকা পাতলা লম্বা ধাঁচের ফিগার, শাড়ির বিজ্ঞাপনে একদম মারকাটারি হবে। সেই যে হাতের ওপর খানিকটা আঁচল ফেলে—যদি টি. ভি-র বিজ্ঞাপনে পেয়ে যায় তোমায় লুফে নেবে।

থাক আর লুফালুফিতে কাজ নেই। আপনার হয়েছে তো ?

যাচ্ছি।

এই, এই, প্লীজ। দাঁড়াও আর একটু। একটা মেয়ে ঘুম থেকে উঠে আলুথালুভাবে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে বলছে, 'উঃ। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে—'এইটা পোজ দিয়ে যাও।

অর্থাৎ মাথাটা ধরার ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপন, কেমন ?

কারেক্ট।

আলুথালুভাবে আলস্য ভাঙা আমার দ্বারা হবে না। আপনার গিন্নিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই, এই, টুনি লক্ষ্মীটি। আমার গিন্নি এমন ললিতলবঙ্গলতা বাহুবল্লরী কোথায় পাবে ?

এতদিন তো ওতেই দিব্যি চলছিল।

যখন বিদ্যুৎবাতি ছিল না, মোমবাতি দিয়েই কাজ চালিয়েছে মানুষ !

জানি না। ওসব আলস্য ভাঙা-টাঙা পারব না।

বলেই টুনি একটু থেমে বলে, আচ্ছা যতরকম বিজ্ঞাপন দিতে মেয়েদেরকেই কাজে লাগানো হয় কেন বলুন তো ? কত সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি যে দেখি।

সুবীর একটু হেসে বলে, কেন, তা বোঝ না বুঝি ?

না বুঝি না। রাগের গলায় বলল টুনি।

সুবীর অবশ্য দমল না। বলল, মেয়েদেরকেই কাজে লাগানো হয় তার কারণ মেয়েদেরই একটি নমনীয় নারীদেহ আছে বলে। যা বিশ্ব-জগতের প্রধান আকর্ষণীয়।

খুব খারাপ মনোভাব।

কী করব বল ? বিজ্ঞাপনদাতারা তো মানবজাতির ধর্মে মতি আনাবার

চেষ্টায় নামেনি। তারা চায় পয়সা। আর যা থেকে সেটা আসতে পারে তাই দেখে।

আপনি একে সমর্থন করেন।

আমার কথা বাদ দাও। আমি তো দীনহীন একটা আদার ব্যাপারী। তুচ্ছ একটা অ্যাডভার্টিজমেণ্ট কোম্পানির অতি তুচ্ছ একটা ডিপার্টমেণ্টের মাইনে-করা চাকর। আমার দৌড় কিছু তেল সাবান মাজন শ্যাম্পু হেয়ার লোশন সিঁদুর লিপস্টিক নেলপালিশ, কি বড়জোর দুটো মাথাধরার বড়ি পর্যন্ত। ফালতু রোজগারের আশায় এটা ওটা করে বেড়াই। তবে পৃথিবীতে কত দামী দামী মাথা-মগজ শুধু এই 'বিজ্ঞাপন' জিনিসটা নিয়ে অবিশ্রাম মাথা ঘামিয়ে চলেছে. তার কোনো ধারণাই নেই তোমার।

ধারণার দরকারই বা কী। ওই মাথা খাটুনির মূল লক্ষ্য যদি হয় মেয়েদের ভাঙিয়ে খাওয়া, তো যত না বুঝি ততই ভাল। একটা মেয়ের ছবি মানেই তো একটা নারীদেহের ছবি। তাকে নিয়ে—

সুবীর ওর রাগরাগ মুখের দিকে তাকিয়ে আরো রাগাবার তালে, (যেটা সুবীরের স্বভাবসিদ্ধ) হেসে বলে,· শুধু যে-কোনো একটা নারীদেহ? আমাদের ওই কৃষ্ণার দিদিমার দেহটা হলে চলবে? বল যে একটি সুঠাম সুন্দর তরুণী নারীর ছবি।

জানি জানি। দেখছি তো। টি ভি-র পর্দায় ফুটে উঠল এক মহিলা, সর্বাঙ্গে সাবান মাখছেন। মানে হয়?

ওঃ। টুনি। কী বোকার মত কথা। মানে হয় না? যে মুহূর্তে পর্দায় ওই ছবিটি ভেসে ওঠে, অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা। নাচে রক্তধারা। সুবীর হা হা করে হেসে ওঠে।

টুনি রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে ওই হাহা হাসিটার ঔজ্জ্বল্যে আটকে গেল।

বলল, ওঃ সুবীরদা, আপনি যা না একখানা। লুনাদি এতদিনেও আপনাকে একটু ভবিযুক্ত করে তুলতে পারেনি।

তোমার বুঝি খুব ভবিযুক্ত বর পছন্দ।

আমার কথা ছাড়ুন। মাথা নেই তার মাথাব্যথা। আমি যাচ্ছি।

এই এই, আরে শোনো শোনো।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টুনির একটা হাত ধরে ফেলল সুবীর। আড়ি করে চলে যাচ্ছ? আর কেপালে হবে। ভাব করে যাও।

টুনি বলে ওঠে, আচ্ছা করছি। এই বললাম—ভাব। ভাব। ভাব। আড়ি ছেড়ে ভাব। হয়েছে? যাই এবার?

আচ্ছা এলেই এমন ছটফট কর কেন বল তো? ছবি আঁকার জন্যে ডাকলে বিরক্ত হও।

ওমা। তাই বলেছি?

তবে অমন পালাই পালাই করো কেন?

কেন করে, সেকথা আর কী বোঝাবে টুনি। মেয়েদের সহজাত অস্বস্তিই ভিতর থেকে বলতে থাকে আর নয়, আর নয়, এটা ঠিক হচ্ছে না।

অথচ লুনা যখন এসে বসে। অথবা খাবার টেবিলে বসবার ঘরে, অলক এসে জুটলে। পরম নিশ্চিন্ততায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়।

টুনি বলল, পালাই পালাই আবার কী। আপনার যত অদ্ভুত কথা। লুনাদি বেচারি একা এত খাটছে।

লুনা কড়ায় তরকারি কষতে কষতে বলল, হল?

টুনি ওর নির্মল মুখের দিকে তাকাল।

টুনি নিজের কাছে নিজে লজ্জা পেল। এরা কী নির্মল, নিঃসঙ্কোচ, নিশ্চিন্ত। টুনি নিজের মনের দোষে অস্বস্তি পায়। এখন তাই সহজভাবে বলে উঠল, ছবি তো কোনকালে হয়ে গেছে। হচ্ছিল ঝগড়া।

তা ভাল। হঠাৎ কী নিয়ে লাগল ঝগড়াটের সঙ্গে?

লুনা হাসল মুখ তুলে।

লুনার কপালের সিঁদুর টিপটা ঘাম ঘাম হয়ে একটু ছড়িয়ে পড়েছে। টুনি যেন নতুন করে মুগ্ধ হল।

বলল, না না, ঝগড়া বাধাবার গোড়া আমি। এই সবসময় যত রাজ্যের যত হেড বেহেড বিজ্ঞাপনের জন্যে মেয়েদের ছবি ব্যবহার করার বিপক্ষে প্রতিবাদ তুলছিলাম। আমার মতে এটা কুরুচির পরিচায়ক।

তা যা বলেছিস। এক একটা জিনিস নিয়ে এমন সব ছবি দেয়, গা জ্বলে যায়। তবে ও অবিশ্যি তেমন বাজে কিছু আঁকে না।

উনি না আঁকুন আর কেউ আঁকেন। শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে যায় অনেক সময়।

এই নিয়ে ঝগড়া করছিলি ?

হুঁ।

লুনা হাসতে হাসতে বলে, রোজ ঝগড়া করবার জন্যে নিজস্ব একটা লোক দরকার হয়েছে তোর। এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।

কেন, আর বাড়ির একপাশে একটু জায়গা দিতে পারছ না ?

লুনা বলে, এরকম পাকামির কথা বলবি তো গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দেব তা বলে দিচ্ছি। তো আমার বাড়ির একপাশে একটু জায়গায় চিরকাল থাকবি নাকি তুই ? এমন মহারাণীর মত রূপ নিয়ে এসেছিস। দেখি কোথায় কোন মহারাজ তপস্যা করছেন বসে।

লুনাও কি তার পিসি-শাশুড়ির স্বপ্নের ছায়ায় লালিত একটুকরো স্বপ্ন দেখছে ?

ভোরের প্লেনে এসে পেঁছিল অভীক।

আর এসেই বলল, যাই একবার সুবীরদার বাড়ি ঘুরে আসি।

কথাটা পছন্দ হল না প্রমীলার। বলল, এই তো এলি। আমিই এখনো ভাল করে দেখলুম না। তাড়া কি বাবা ? কেউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

সে তো যাচ্ছেই। সুবীরদা অফিস চলে যাবে।

প্রমীলা চাইছিল না অভীক হঠাৎ গিয়ে সেই মেয়েটাকে দেখে ফেলে। না-সাজাগোজা কী অবস্থায় আছে কে জানে। যদিও সে মেয়ের সাজাগোজা লাগে না। তবু—

মনে মনে মনঃস্থির করে ফেলেছিল প্রমীলা। হোক গে ভিন্ন জাত, উঁচু বই নিচু তো নয়। ওই মেয়েকেই বব করবে সে। তাছাড়া যখনই ওবাড়ি বেড়াতে যায়, সত্যি বলতে আজকাল একটু ঘনঘনই যায়। সুবীর বলে, পিসির হঠাৎ এত টানের বাড়াবাড়ি যে লুনা। ব্যাপার কী ?

লুনা বলে, ব্যাপার আবার কী। কাছেই আপনজনের বাড়ি থাকলে বেড়াতে আসতে ইচ্ছে করে না।

তা এর বেশি আর কিছু কথা হয় না। কিন্তু দুজনেই বোঝে, এখন

কৌতূহলের প্রধান কারণ ওই টুনি। নিশ্চয়ই দেখতে আসেন কীরকম রীতিনীতি আচার-আচরণ মেয়েটার। নুনা কীভাবে ব্যবহার করছে ইত্যাদি। তবে ওরা কেউই ভাবে না পিসির মধ্যে একটি স্বপ্ন রচিত হবে। তবে ওরা জানে এ প্রশ্ন নেই। পিসি যা কট্টর। আর নুনা ভাবে পিসিকে তুতিয়ে-পাতিয়ে বলে-কয়ে যদি—

ওর মা-বাপ নেই, কাজেই পিসির ছেলের বিয়েতে কিছু পাওনা-থোওনা হবে না· তাও ঠিক নয়। নুনা তাদের সাধ্যের অতিরিক্তই করবে, আর সেটার আভাসও পিসিকে দিয়ে রাখবে।

তবে এস বতো নুনার ভাবনা।

প্রমীলার ভাবনা অদিনে-অক্ষণে হঠাৎ মেয়েদেখা। প্রমীলার চোখের আড়ালে।

বলল, তা এখন তাড়াহুড়োর সময় কেনই বা। সন্ধেবেলা একেবারে তোতে-আমাতে দুজনেই যাব।

অভীক চোখ কপালে তুলে বলে, তোতে-আমাতে মানে? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলব? না কি সুবীরদারা আমাকে চিনতে পারবে না?

আহা তা কেন? একসঙ্গে যাব, বেশ·সবাই মিলে গল্প-সল্প হবে।

যেটা পালিয়ে যাচ্ছে? এখন চললাম। একটা গাড়ি এনেছি। বলে আসি দু-চারদিন ছুটি নিয়ে এস সুবীরদা, সবাই মিলে এনতার বেড়ানো যাবে।

প্রমীলা থমকে বলল, গাড়ি এনেছিস, আনা যায়?

কী মুশকিল, যাবে না কেন?

প্রমীলার গলায় নীরসতা এল, তো গাড়ি এনেছিস তা কই আমায় ·বললি না? ওদের বলতে ছুটছিস?

অভীক জোর গলায় হেসে ওঠে। বলে, ওমা। তুমি যে বাচ্চা খুকির মত—ওরটা বেশি আমারটা কম বলে নাক ফোলাচ্ছ।

প্রমীলা বলল, আহা! ছেলের কথার কী ছিরি। এতদিন পরে এলি দুদণ্ড দেখি তোকে। তা নয়—

ঠিক আছে। তবে এখনই চল সেই যে কী বললে মায়ে-ছেলেতে। আসলে কী জান মা, সুবীরদা তো জেনেছে আমি ভোরের ফ্লাইটে চলে এসেছি হয়তো আশা করছে একবার যাব বলে। সারাদিন ঘরে বাসি হয়ে তারপর

যাওয়ায় কোনো চার্ম নেই। আজ সন্ধে মানে যে-কোনদিন সন্ধে। চল চল।

দ্যাখ তো পাগলের কথা। আমি এখন যাব কী? কাজ নেই?

কেন, তুমি যে বললে ভোররাতে উঠে পুজো সেরে রেখেছ।

ওমা! পুজো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই? রান্না করতে হবে না।

ওঃ রান্না, মানে যার একমাত্র মিনিং হচ্ছে কান্না। তো বাড়িতে আর কাউকে নেমন্তন্ন করে বসেছ না কি? ছেলে আসছে উল্লাসে।

এতদিন কোথায় না কোথায় কাটিয়ে এলি অভী, কথাটি তো দেখছি ঠিক তেমনি আছে। ছেলে বাড়িতে এসে না পৌঁছতেই লোকজন নেমন্তন্ন করে বসব?

ওঃ তাও তো বটে। অভীক অনায়াস গলায় বলে, ধরো, প্লেনটা ক্র্যাশ হল। লোকগুলোর কী মুশকিল। খেতে এসে স্বস্তিতে খেতে পাবে না।

অভী ছেলেবেলার মত থাবড়া খেতে ইচ্ছে। হঠাৎ লোক খাওয়া-টাওয়া কী কথা।

আহা তুমি রান্না বলে যে রকম ভয় পাচ্ছ। খাবার মধ্যে তো তুমি আমি আর অলক? তো তোমার সেই জিনিসটি চড়িয়ে দিও না বাবা। তুমি সকালবেলা যার নাম না করে বলতে 'চালে-ডালে একপাক'। আহা, কতদিন যে খায়নি সে জিনিস! সেই যে ওই একপাকের মধ্যে আলু পটল কপি কড়াইশুঁটি ইত্যাদি নানান মালপত্র ফেলে দিতে। আর তারপর কী যেন চমৎকার একটা ফোড়ন। আহা! মনে পড়ে মন উচাটন হয়ে গেল। শুনে হেস না, বহুবার চেষ্টা করেছি নিজে নিজে বানিয়ে নিতে, সে টেস্ট আসেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ তোমার রান্নাঘরে ওই মেনু? তবে আর কি, চটিটা পরে বেরিয়ে পড়। অলক কোথায়?

ওই একটু দই এনে রাখতে গেছে। যা দোকান-বাজারের অবস্থা হয়েছে, একটু বেলা হয়ে গেলে আর পাবে না।

খুব ভাল। লোকের খরচ বাঁচবে। তাহলে আমি এগোচ্ছি। তুমি অলক এলে—

প্রমীলা বলল, আচ্ছা তুই এগো তো। আমি কী করি না করি দেখিস।

আমি তার আগেই দেখতে পাচ্ছি!

কী দেখতে পাচ্ছিস?

ওই যে করি না করি! ওর মানেই না করি। হো হো করে হেসে বেরিয়ে গেল অভীক, সদ্য পাটভাঙা শাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে।

লুনা দেখে খুব হৈচৈ করে উঠল। বলল, কোনো ইরানি সুন্দরী-টুন্দরীকে পকেটে ভরে নিয়ে আসেনি তো? এসেই এখানে চলে এলে, পিসিমা বকলেন না? গেলে নিশ্চয়ই একা যেতে দেওয়া হবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিয়ের পর একবার মাত্রই দেখেছে লুনা অভীককে, কিন্তু সম্পর্কের মহিমায় 'চিরকেলে বউদির মত বউদিগিরি' করতে বাধছে না।

অভীক হেসে বলল, এইসব জটিল আর কুটিল প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যায় না। পরে হবে, একটি একটি করে। মার সঙ্গে রীতিমত ফাইট করে এক্ষুনি চলে এসেছি, সুবীরদার জন্যে। পাছে কেটে পড়ে। কী? সুবীরদা বুঝি চানের ঘরে? নো সাড়া, নো শব্দ।

সুবীর সাবানের ফেনাভর্তি গালে একখানা শুকনো তোয়ালে ঘষতে ঘষতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং উল্লাসের ভঙ্গিতে বলে উঠল, আরে এসেই চলে এসেছিস? গুড। বোস বোস।

তবু অভীকের হঠাৎ মনে হল, সুবীরের এই অভ্যর্থনায় যেন হৃদয়ের উত্তাপের অভাব।

আর তারপর কিছুক্ষণ কথা বলার পর মনে হল ওর মার সঙ্গে এত লাঠালাঠি করে এক্ষুনি আসার কোনো দরকার ছিল না বোধহয়।

সুবীরের ভঙ্গিতে কেমন যেন চাঞ্চল্য।

বারবার পাশের বারান্দার দিকে চোখটা চলে যাচ্ছে কেন সুবীরদার? ওখানে কি ওর কোনো ফুটোফাটা গেঞ্জি পায়জামা শুকোচ্ছে, যেটা সদ্য বিদেশ-ফেরতের চোখে পড়লে লজ্জা পাবে?

তবু অস্বস্তি ছেড়ে অভীক নিজস্ব ভঙ্গিতে জোর গলায় বলল, চটপট এসে সুবীরদাকে ধরে ফেলবার উদ্যোগটা কী জান বউদি? সুবীরদা যাতে আজ অফিসে গিয়ে এ সপ্তাহটা ছুটি নিয়ে চলে আসে।

কথা বলতে বলতে খাবার টেবিলের কাছেই চলে এসেছিল অভীক।

একা একখানা থালা সামনে নিয়েই বসেছে সুবীর। দু-একদিন একসঙ্গে

তিনটে থালা পড়লেও, টুনি বলেছিল, আচ্ছা আমরা কেন এক্ষুনি খেতে বসে যাচ্ছি ? আমাদের অফিস আছে ?

লুনা হেসে বলেছিল, আর বলিস না। ও একা খেতে পারে না। আমাকেও তাই—

তা তোমার অভ্যাস আছে। তুমি বোস লুনাদি, আমার তো তোমার সমারোহের ব্রেকফাস্ট এখনো গলার কাছাকাছি। কাল থেকে তাহলে সকলে স্রেফ একটা বিস্কুট আর এককাপ চায়ের ব্যবস্থা কর।

কিন্তু তাই বা কী করে হয় ? টুনির শরীরে পুষ্টির দরকার, টুনি এতকাল ওর মার অসুখের জন্য মায়ের হাতের যত্ন থেকে বঞ্চিত। লুনা 'দিদি' হয়। সকালে ওকে চায়ের সঙ্গে টোস্ট, মাখন, ডিম, কলা, চিজ, সন্দেশ এসব খাওয়াবে না ? সকালে ছাড়া খাওয়াবার সুবিধে কখন ?

পরিস্থিতি অনুধাবন করে সুবীর বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, খাবার টেবিলের ধারে তোমরা উভয়ে বিরাজ করলেই হবে।

তো আজ অবশ্য 'উভয়ে' নয়, একা লুনাই বিরাজিতা। টুনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি হয়নি। বলেছে, চিনি না, জানি না, থাক না বাবা।

আরে অলকের দাদা, পিসিমার ছেলে, আমার দেওর, ওর ভাই। এত জেনেও না জানা ?

তা হোক বাবা ? হবে, আসবেন তো এখন ?

সে আর বলতে ! কালই তো ডাকব ভাবছি দুই ভাইকে।

আচ্ছা কালই হবে।

অভীকের মনে হল, আগে হলে সুবীরদা হৈচৈ করে বলে উঠত, এই বসে পড় আমার সঙ্গে। ভাত না খাস, দুটো মাছভাজা খা।

সুবীরদার মধ্যে সেই প্রাণের স্পর্শটা কোথায় গেল ? মনে হচ্ছে যেন মনটাকে চাবিবন্ধ করে ফেলেছে।

লুনা অবশ্য ঠিকই আছে। বরং, বয়েসের মাহাত্ম্যে আরো বেশিই আছে। সে বলে উঠল, হঠাৎ সপ্তাহখানেকের ছুটি ! ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে যে !

গোলমালের কিছু নেই। খুব সোজা আর সিম্পল। একখানা গাড়ি আনা হয়েছে সঙ্গে, তাই ঠিক করেছি, দু-চারদিন সবাই মিলে কষে ঘুরে নিই। লক্ষ্যস্থল নির্বাচনের দায়িত্ব বউদির।

মেয়েরা নাকি ঈর্ষাপরায়ণ ! অন্তত এমনি একটা অপবাদ তাদের আছে,

কিন্তু পুরুষ জাতটারও কি কেউ কেউ অন্তত হিংসুটে নয়? বিশেষ করে তেমন কিছু-না-হওয়া জৌলুসহীন পুরুষের এক কৃতী জৌলুসবান অপর পুরুষের প্রতিহিংসে না হয়ে যায়? তা সে হলেও স্নেহভাজন কনিষ্ঠ।

গাড়ি আনা হয়েছে এবং সেই গাড়ি চড়ে বেড়ানোর সাদর আহ্বান।

চড়াৎ করে উঠল মাথাটা। যদিও সদ্য স্নান করে আসা মাথা। বলতে হয় হিসেবে বলল, গাড়ি-ফাড়ি নিয়েই চলে এসেছিস? তার মানে পাকা-পাকিই চলে এলি। কাজটা কি খুব বুদ্ধিমানের মত হল?

অভীক একটু হাসল। বলল, সবসময় অন্যের কাছে নিজেকে বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করতে করতে, আমরা ভিতরে যে কী বোকামিই করে বসি সুবীরদা! আমার প্রাণ কাঁদছে কলকাতার জন্যে, কলেজ স্ট্রিটের বইবাজারের জন্যে, কফি হাউসের জন্যে, গড়িয়াহাটের ফুটপাথের ধারে সাজানো পুরনো বইয়ের স্টলের জন্যে, মঞ্চাঙ্গনের নতুন নতুন সব নাটকের জন্যে, আর অন্যেরা আমায় পাছে বুদ্ধিহীন ভাবে, তাই আবার সেই আমাদের কালচারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন দেশে পড়ে থাকতে যাব চিরকাল?

সুবীর মনে মনে বলল, কন্ট্রাক্ট ফুরিয়ে গেছে বাবা, কোম্পানি বলেছে, এবার কেটে পড় মানিক। তাই এত লম্বা বচন! তা এ চিন্তাও হিংসের জ্বালা থেকেই উদ্ভূত বোধহয়।

সুবীরের মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া, কফি হাউস, ফুটপাথের পুরনো বইয়ের স্টল এই হলেই ব্যাস। টাকাটা কোনো ফ্যাক্টরই নয়, কেমন?

আবার মনে হল অভীকের, সুবীরদা বদলে গেছে। আগের সুবীরদা হলে বলে উঠত, গুড আইডিয়া। থ্যাঙ্কিউ। নিজের মাটিতে চরে খাওয়ার থেকে আর সুখ আছে?

তা নয়, টাকার কথা তুলল।

অভীক অবশ্য অপ্রতিভ হল না। বলল, তা বলছি না অবশ্যই। তবে কিছু রোজগার কী আর করতে পারা যাবে না এখানে? মোটামুটি চলে যাবার মত? অনেক টাকার দরকার কী? অনেক টাকার দেশ-ফেশ দেখে-টেখে অনেক টাকায় তেমন মোহ নেই সুবীরদা। বেশি টাকায় মানুষ ক্রমশই যন্ত্র বনে যায়।

আর টাকাটি না থাকলে, এমন প্রেমসে গাড়ি চড়িয়ে বেড়িয়ে আনবার

অস্বীকার দেওয়া যায় ? এটাই কি কম ? এখানে এমন কিছু চাকরি জোটাতে পারবি যাতে গাড়ি-বাড়ি হয় ?

অভীক হাসল, গাড়িটা কিন্তু আমার স্বোপার্জিত নয় সুবীরদা। কোম্পানি ব্যবহার করতে দিয়েছিল। কিছুতেই আর কণ্ট্রাক্টটা রিনিউ করতে রাজি হলাম না দেখে, 'কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে' গাড়িটা প্রেজেন্ট করে বসল।

সুবীরের মনে পড়তে লাগল লক্ষো এবং অলক্ষ্যে দু-দুটো মেয়ে অভীক নামক মহিমান্বিত পুরুষটির মূল্য আর আদরের বহরের কাহিনী শুনেছে। সুবীরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ! উঠে পড়ে হাত ধোয়ার জন্যে যেতে যেতে মুখ বাঁকিয়ে বলল, তা সেই যে পিসি কী বলে একটা, মনসার দায়ে ঢাক না কি ? তাই হল নিশ্চয় ? গাড়ি তো দিলেন তাঁরা। তার ডিউটিটা কে দেবে ?

অভীক অবহেলার গলায় বলল, সেটাও ওরাই দিয়ে দিয়েছে। টাকার তো মা-বাপ নেই। দিয়ে দিল ওখান থেকেই।

সুবীরের এ প্রসঙ্গ আর ভাল লাগছিল না, বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। সময় হয়ে গেল। বসছিস নাকি একটু ? না বসিস তো চল একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাক !

লুনা তাড়াতাড়ি বলল, ওমা, বসবে না একটু ? তোমার সঙ্গে যাওয়ার কী আছে ?

হেসে বলল, তোমাকে তো আর তোমার কোম্পানি গাড়ি দিয়ে রাখেনি যে, যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে যাবে ? তোমার বাসস্ট্যান্ড এদিকে, পিসিমার রাস্তা ওদিকে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

মুখটা কালো হয়ে গেল সুবীরের। গম্ভীর মুখে একটু তিক্ত হাসি হেসে বলল, গাড়িবান হবার মত ভাগ্যমন্ত চাকরি কি আর ভ্যাগাবণ্ড সুবীর সামন্তর হবে ? আচ্ছা বোস। চলি।

অভীক কিন্তু বসল না। বলল, না না আর-দেরি করলে মা ভীষণ রেগে যাবে।

বেরিয়ে পড়ল দুজনেই।

লুনা বলল, বাব্বা টুনি। তুই যে একেবারে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলি।

অভীক ঠাকুরপো কী একেবারে মস্ত বড়। মাত্র তো আমার থেকে ছ মাসের বড়।

লুনার জীবনের অংক এমনি সরলাংক।

যেহেতু টুনি লুনার থেকে পাঁচ বছরের ছোট, অতএব সুবীর ওকে তুমি বলবে। ঘনিষ্ঠ হবে। যেহেতু অভীক লুনার থেকে মাত্র ছ মাসের বড়, অতএব টুনি অভীকের সঙ্গে অনায়াসে হৃদ্যতা করতে পারে।

কিন্তু, বিশ্বাস আর সরলতা, এর একটা আপাতশক্তি আছে।

লুনা যখন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, কী মজা কী মজা। খাবার-টাবার সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে জয়রামবাটি, কামারপুকুর, হংসেশ্বরীর মন্দির, ত্রিবেণী। এক একদিন এক একদিকে অভিযান। মার্ভেলাস!

তখন সুবীর বলতে পারল না ছুটি নিয়ে ওইসব দেখা জায়গায় বেড়াতে যাবার কোনো মানে আছে?

বলতে পারল না।

পারল না হয়ত দুটো কারণেই। টুনিকে বাদ দিয়ে তো আর লুনার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আর টুনিকে ওই ঝকঝকে ইয়ারমার্কাটির সঙ্গে উদয়াস্ত বেড়াতে ছেড়ে দেবার মত উদারতাও খুঁজে পায় না।

কেমন করে যে টুনি সুবীরের 'সম্পত্তি' বলে গণ্য হতে শুরু করেছে সুবীরের কাছে এটাই আশ্চর্য! সুবীরের যেন পাহারা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাওয়াগাড়ির হাওয়ায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে অনিবার্যতাকে।

অথচ সুবীর এমন ছিল না।

সুবীরের নিজের মনের গতি বিপথের দিকে, তাই সুবীরের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে হিংসা, কুটিলতা, অন্যের হাসি আহ্লাদে বিরক্তি।

এই নিত্য পিকনিকের প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হচ্ছে অলক।

অভীক বলে, এই অলক তুই বউদিদের সঙ্গে কনসাল্ট করে খাবারের মেনু, বেড়াবার প্রোগাম, এগুলো ঠিক করে ফেল, তারপরে তোর দাদা গৌরী সেন।

প্রথমদিন প্রমীলা বলেছিল, তোরা যাচ্ছিস ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে, আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

অভীক বলেছিল, দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে গিয়ে কী কর?

শোনো কথা। মন্দিরে গিয়ে আবার কী করি? দেবীদর্শন করি, পুজো-প্রণাম করি।

বল যে দেবীমূর্তি দর্শন করি!

তা তাছাড়া আবার কে বলতে যাচ্ছে দেবীর চিন্ময়ীরূপ দেখতে যাই!

তবে আর কি এখানেও ঈশ্বরপুত্রের মূর্তি দর্শন করবে।

আর লুনা বলেছিল, সে কি পিসিমা, ছেলের গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে বেড়াবেন এতে আপনার আপত্তি? আমার তো আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করছে।

আহা, আপত্তির কথা হচ্ছে না। তবে ঠাকুর-দেবতার জায়গা হলে সবটাই সার্থক।

তো তাই হোক।

দেখে বেড়াও কোথায় কী মন্দির-টন্দির আছে। মন্দির মানেই তো ইতিহাস। মন্দির মানেই তো স্থাপত্যশিল্প। বাংলাব মন্দির মানেই বিশেষ এক শিল্পসুষমার ধারক-বাহক।

হয় ভোরবেলা বেরিয়ে, যেখানে ইচ্ছে গাড়ি রেখে নেমে দেখে বেড়িয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিখ্যাত বিখ্যাত সব মিষ্টি কিনে খাওয়া এবং গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়া বহুবিধ আহার্যবস্তু বার করে ফেলে মিলে-জুলে খাওয়া। ভাগ করার ভার সাগ্রহে নেয় লুনা। সঙ্গে নেয় টুনিকে। অভীকের আনা চমৎকার পিকনিক সেট দেখে টুনি লুনা মোহিত। এই ছ ইঞ্চি জিনিসটুকুর মধ্যে ছ ছটা গেলাস। ছটা ডিশ কাপ এইটুকু প্যাক-এর মধ্যে? ওমা! প্রত্যেকের জন্যে আবার আলাদা থার্মোফ্লাস্ক। সত্যি অভীক ঠাকুরপো, তুমি না একখানা পাকা গিন্নি। তোমার যে বউ হবে, সে বাবা তপস্যা করেছে। ও পিসিমা। এই দেখুন আপনার ছেলের ব্যবস্থা—আপনার জন্যে একদম নতুন ফ্লাস্কে বাড়ি থেকে আনা বিশুদ্ধ চা। আর খুঁতখুঁত করা চলবে না। ও অলক, কী বললি, গঙ্গার ধারের চাতালে সাপ খেলানেঅলা সাঁপ খেলাচ্ছে। ও অভীক ঠাকুরপো, আর আমরা এখানে বোকার মত বসে আছি?

অভীক একটু হেসে বলে, কে বলতে পারে, সকলেই আমরা ওই একই কাজ করছি কিনা।

সুন্দর-রহস্য বড়ই জটিল সন্দেহ নেই।

অভীক বলল ওই মেয়েটি সুবীরদাদের কে হয় মা? ভারী সুন্দর ইনটেলিজেন্ট মেয়ে।

অমনি প্রমীলার বুকটা ধক করে উঠল, আর মনটা বেজার হয়ে গেল। মনে হল তাঁর বড় ছেলে যেন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল। তিনি ভেবে বসে আছেন দু-চার দিন দেখার পর তিনিই বলবেন, লুনা বউমার ওই বোনটিকে কেমন দেখলি ?

তারপর আস্তে আস্তে বিবাহ-বিমুখ ছেলেকে স্বমতে আনবেন। ওমা, এ যেন মনে হচ্ছে, প্রমীলার কোনো ভূমিকাই থাকবে না।

অতএব গলার স্বর নির্লিপ্ত, মেয়েটার খুব সুবুদ্ধি, ভাল মেয়ে। মা-বাপ মরা মেয়েটাকে লুনা বউমা নিজের ঘাড়ে নিয়েছে।

অর্থাৎ মেয়েটা তেমন কিছু দামী নয়।

অভীক বলল, লুনা বৌদির মত মেয়ে পৃথিবীতে বেশী নেই।

প্রমীলা অবশ্য এ কথায় একমত। তারপর হঠাৎ কী ভেবে দুম করে বলে বসল, মেয়েটাকে তোর পছন্দ ?

অভীক অবশ্যই অবোধ সাজল। বলল, বললাম তো অমন মেয়ে পৃথিবীতে বেশী নেই।

আ আমার কপাল। আমি কার কথা বলছি ?

কেন বউদির কথাই তো হচ্ছিল।

মাও ঘোড়েল। বলল, ন্যাকা সাজিসনে অভী। বলছি ওই টুনি বলে মেয়েটার কথা।

আরে তার কথা তো আগেই বললাম। বিনা প্রশ্নে।

তা বেশ। বলছি মেয়েটাকে তাহলে বউ করি ?

হ্যাঁ, প্রমীলা এখনো নিজেকে একটা অধিকারের ভূমিকাতে দাঁড় করাতে চেষ্টিত।

মেয়েটাকে তাহলে বউ কর না বলে, মেয়েটাকে তাহলে বউ করি।

কী বললে ? অ্যাঁ। হা-হা-হা। জোরে হেসে উঠে অভীক।

ওঃ মা! কী ডেঞ্জারাস মেয়ে তুমি! যে-কোনো একটা ছেলে মেয়েকে যে কারুরই ভাল মনে হতে পারে। তাই বলে, তাকে বিয়ে করতে ছুটতে হবে ?

তা তুই কি বিয়ে করবি না ?

করব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

তবে ?

তবে আবার কী ? আগে একটু সেটলড হয়ে নিই। ওদের ওখান থেকে কিছু টাকা তো আনতে পেরেছি। সেটা দিয়ে কিছু ছোটখাটো বিজনেস করতে পারা যায় কিনা ভাবি। নয়তো টাকাটা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখে একটা মানুষের মতন চাকরি পাই কিনা দেখি।

সে আর পেয়েছিস ! প্রমীলা অবজ্ঞার গলায় বলে, যা দেশ তোদের। বরং যা ছিলি, ভালই ছিলি। সোনার দেশ !

অলক এল।

অভীক হেসে উঠে বলল, অলক শোন শোন, মজার কথা। আমি যখন বাইরে ছিলাম, তখন মার চিঠির বুলি কী ছিল মনে পড়ে তোর ? খোকা তুই কবে আসবি ? খোকা কতদিন তোকে দেখছি না। খোকা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়, বেশি টাকায় আমার দরকার নেই, এই সব কিনা বল ?

হ্যাঁ তো। তা কী হল তাতে ?

কিছু হল না। এখন যেই বলেছি, এখানেই থেকে যাব—মা বলতে লেগেছে, এখানে মাইনে কম। হা-হা-হা।

প্রমীলা রেগে বলল, আমার নিজের জন্যে বলছি নাকি ? তোর ভালর জন্যেই বলছি।

আমার ভাল তো বলেইছি কলকাতার বইমেলায়, রবীন্দ্রসদনের ফাংশানে, মুক্তাঙ্গনের নাটকে, কবি সম্মেলনে, কফি হাউসে।

অলক হেসে বলে ওঠে, ওই জন্যেই নন্দা বউদি তোমায় এত ভক্তি করে।

ভক্তি ! অ্যাঁ, কী বললি ?

আহা, ভক্তি না হোক শ্রদ্ধা। বলে, অভীকের মত ছেলে হয় না। কী উঁচু মন। টাকাকেই ধ্যান-জ্ঞান করেনি।

আহা ! শুনে কান জুড়লো রে।

অভীক বলল, মা শুনলে ?

কী আবার শুনলাম ?

ওই যে কেবলমাত্র বিয়ে করে ফেলবার ইচ্ছে থেকেই লোকে লোককে ভাল বলে না !

তোমার সঙ্গে কে তর্কে পারবে বাবা ?

বলে চলে যায় প্রমীলা। কিন্তু যতই তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকো বাছা মায়ের চোখ এড়াতে পারবে না। সে কখনও ভুল দেখে না। তোমারও

ওকে দেখলেই চোখমুখে আলো জ্বলে ওঠে, আর এরও তোমাকে দেখলেই সর্বাঙ্গ উথলে ওঠে, এ আর ধরে ফেলতে বাকি নেই আমার।

কিন্তু শুধু মা-র চোখই বা কেন? বাকি কি কারুই থাকে? 'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?'

কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা কি সকলের এক?

সুবীর নামের একদার ভদ্র মার্জিত হাসিখুশি লোকটার মধ্যে এ আবার কী প্রতিক্রিয়া? মনের আগোচর পাপ নেই, মনের আগোচর উক্তিও নেই। অতএব সেই সভ্য শিক্ষিত শিল্পী সুবীর সামন্তর মনের মধ্যে এই ক্রুদ্ধ গর্জনের লাভাস্রোত বয়ে চলেছে। রাস্কেল! বদমাশ! হাড়বজ্জাত! মার্সেডিজ গাড়ি দেখিয়ে আর পয়সার লপচপানি দেখিয়ে মেয়ে মানুষের মন ভোলাবার কায়দাটা শিখে এসেছিস পাজি! গাড়ি দেখানো! বেড়াতে যাওয়া। ভেতরের মতলব বুঝি না আমি? সংসারের বাইরে গিয়ে পড়লেই ছলছুতোয় কাছে আসাআসি, গা ঘেঁষাঘেঁষির সুযোগ হয়। ওয়াচ করে চলি তো। ঠিক দেখব, একটা পাখি একটা ফুল, কি কোনো মন্দিরের একটু কারুকার্য এই নিয়ে দুজনে ঠিক কাছাকাছি। কথা আর ফুরোয় না। আমিও শালা তাক বুঝে ঠিক গিয়ে পড়ি, যাতে ব্যাপার বেশিদূর না এগোয়। তো ঘুঘু মস্তান, এমন ভাব দেখাবে, যেন এইমাত্র পৃথিবীতে পড়েছে। ইনোসেন্টের অবতার। দরাজ গলায় বলা হবে, এই যে সুবীরদা এসে গেল। তুমিই বলতে পারবে, বিষ্ণুপুর কোন ঘরানার জন্য বিখ্যাত। গানের জন্যে? সুবীরের জন্যে? না কি পোড়ামাটির শিল্পের এই অপূর্বতার জন্যে? না কি বালুচরি শাড়ির জন্যে?

বদমাশ শয়তান, যেন দুটোতে মুখোমুখি হয়ে গুজগুজ করে এই আলোচনাই করছিল। আর ওই টুনিরাণী। ভাব দেখাতেন যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। আমার কাছে দু মিনিট বসতে হলে কী ছটফটানি, যেন ধর্ম রসাতলে গেল। আর এখন? এখন ওটার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলে জ্ঞান থাকে না। কোথা থেকে যে ওই শনিটা এসে হাজির হল। জীবনটা চলছিল যেন কবিতার ছন্দের মত। আর ওই রাস্কেলটা এসে—

আচ্ছা, কেউ বিশ্বাস করবে সুবীর সামান্তর মধ্যে অনবরত এইরকম কুটিল কুৎসিত নির্লজ্জ আর গ্রাম্য শব্দের চাষ চলছে।

না। কেউ কারুর ব্যাপারেই বলতে পারে না। সমুদ্রের কটা ঢেউই বা চোখে দেখা যায় ? কে বোঝে ভেতরে কী দুরন্ত আলোড়ন। তেমনি এই জগতে প্রবাহিত শব্দসমুদ্রের মধ্যে কটি শব্দই বা উচ্চারিত হয় ? অনুচ্চারিতই তো বেশি।

অলক যে অলক, মনে হয় উদোমাদা ছেলেটা। সেও মনে মনে বলে চলে, দাদার সঙ্গে টুনিদির তাহলে লেগে গেল। একখানি জম্পেশ ব্যাপার। হি-হি-হি। ওরা এমন ভাব দেখায় যেন অলকটা একটা খোকা, কিছু বোঝে না। হা-হা-হা! আমিও তেমনি মাঝে মাঝে খোকা সাজি। এই তো কদিন আগেই। গাড়িতে যেতে দেখি সোনারপুরের কাছে না কোথায়, রাস্তার ধারেই একটা দোকানে জিলিপি ভাজছে। আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, টুনিদি দেখলেন! এঃ হে হে ছাড়িয়েই চলে এলাম। ওখানে একটা দোকানে কী দারুণ জিলিপি ভাজছে। আপনার ফেভারিট। কিন্তু দাদা যা কট্টর! ওই গাঁইয়া মার্কা দোকানের জিনিস কি খেতে দেবে ?

টুনিদি বলল, তোমায় কে বলল শুনি, জিলিপি আমার ফেভারিট ? আমি বললাম, কাউকে বলতে হয় না। তখন আপনার চোখ যা চকচক করে উঠেছিল। সবই বানানো। ইতিমধ্যে রুনা বউদিও বলে উঠল, গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখলে কার না চোখে আলো জ্বলে ওঠে রে অলক ? আমার চোখে পড়েনি তাই। আমি বললাম কী করে পড়বে ? আপনি তো গাড়ির ওদিকে।

এর মধ্যে কিন্তু গাড়ি দিব্যি পিছু হেঁটে হেঁটে জিলিপির দোকানের সামনে হাজির। জানি। হতেই হবে। ব্যস, একঝুড়ি গরম জিলিপি গাড়িতে উঠিয়ে দিল দোকানি। দাদা বলল, এই অলক, নে কত খাবি খা! তোর এত প্রিয়। আমি বললাম, বাঃ আমি বলেছি আমার প্রিয় ?

দাদা না হেসে উঠে বলল, বলবি কেন ? চালাক লোকরা নেমন্তন্ন খেতে বসে পরিবেশককে বলে পাশের পাতে দিন, পাশের পাতে দিন। তোরও তাই। আসলে দাদা ধরে ফেলেছে ওটা আমার বানানো গল্প, টুনিদির চোখে মোটেই আলো জ্বলেনি। কিন্তু বানানোটা যে আরো কত সূক্ষ্ম, চালাকির ফল তা কি ধরতে পেরেছে ? তা আর হতে হয় না। ধরে তো ফেললাম রহস্য। টুনিদির নাম না করলে দাদা গাড়ি পিছুতো। ঠিক বলত, দূর বাজেমার্কা দোকান, হয়তো তেলেই ভাজছে। যেই টুনিদি হাসি-হাসি

হাসি মুখে বলল, তোমায় কে বলল শুনি, জিলিপি আমার ফেভারিট—সেই শুরু হয়ে গিয়েছে পিছনো। টুনিদিরা অবশ্য পিছনে বসে, দাদা আমি আর সুবীরদা সামনে। কিন্তু দাদার চোখ যে সর্বদা সামনে টাঙানো আরশিটিতে আটকে থাকে তা কি আর বুঝি না? যাক এ একখানা বেশ ব্যাপার। লোকে আমায় অবোধ অজ্ঞান ভাবছে আর আমি দিব্যি সব ধরে ফেলছি। মা যেদিন যেদিন গাড়িতে থাকে সেদিনকে অবশ্য দাদা বেশ সাবধানে থাকে, আরশির দিকে বেশিবার তাকায় না। নেহাত মা যখন আমায় কী সুবীরদাকে ডেকে ডেকে কথা বলে, তখন মার অন্যমনস্কতার সময় তাকিয়ে নেয় দু একবার। টুনিদিও নেহাত কম নয়, বেশ শাহানসা ভাব আছে। মা থাকলে কেবল, পিসিমা, আপনি অনেক অনেক তীর্থ দেখেছেন পিসিমা, আপনার কোনখানকার মন্দির সব থেকে ভাল লেগেছে?

অলকের মধ্যে সর্বদাই এই একটি গোপন রহস্য ধরে ফেলার আহ্লাদ। অনেকটা গোয়েন্দা গল্প পড়ার রোমাঞ্চের মত।

আর লুনা?

বুদ্ধি-সুদ্ধি সম্পর্কে যার কোনো উচ্চ প্রশংসার দাবি নেই, সেই লুনা? তা বেশি বুদ্ধি ধরে না বলে কি, চোখের সামনে একখানা প্রেমের ব্যাপার ঘটছে দেখেও ধরতে পারবে না? ধরতে খুবই পারছে, কারণ এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক যে তার সরলাঙ্কের মধ্যে এসে যায়। কিন্তু যেটা অস্বাভাবিক, যেটা জটিলাঙ্কর দুরূহ পথে ঘুরে মরে দুরূহতর হয়ে চলেছে এবং ক্রমশ জটিল জালে পরিণত হয়ে চলেছিল, সেটা তার গোচরে আসেনি।

লুনা শুধু জানে দুই আর দুইয়ে চার হয়।

দুটো অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর (তায় যদি আবার রূপগুণ সম্পন্ন হয়) দর্শন মাত্রেই প্রেম সঞ্চার হয়।

লুনার চেতনার জগতে দুই আর দুইয়ে পাঁচের হিসেব নেই। তাই লুনা রাত্রে ঘরে এসে বরের গা ঘেঁসে বসে মুখ টিপে হেসে বলে, ব্যাপারখানা লক্ষ্য করছ?

সুবীর ভুরু কুঁচকে বলল, কিসের ব্যাপার?

জানি। জানি তুমি এইরকম আকাশ থেকে পড়বে। তোমার ভাইটি যে আমার বোনটির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন দেখতে পাও না?

সুবীর সেইভাবেই বলল, তা এতে এত আহ্লাদের কী আছে ? ব্যাপারটা যাতে বাড়তে না পারে সেটাই দেখা দরকার।

ওমা ! কেন ? যাতে বাড়তে না পারে মানে ? আমি তো বরং যাতে বাড়বৃদ্ধি হয় সেই আশায় চারাবেলা থেকে জলসিঞ্চন করে চলেছি।

সুবীরের মুখটা কঠোর-কঠিন দেখায়।

কড়া গলায় বলে, হুঁ, তা লক্ষ্য করেছি। তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনিই করবে তো ? এসব অসামাজিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণাম জান ?

লুনা বেশ অবাক হয়ে গেল।

ভাবছিল এই নিয়ে বেশ একটু মজলিশ করবে আজ বরের সঙ্গে এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে টুনির শ্যামের বাঁশী শুনে রাইয়ের অবস্থা, আর কোন কোন মহামুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের রাধার আঁচলের ছায়া দেখলেই হাতের পাঁচনি খসে পড়ে ; তাই নিয়ে বিশদ হবে, তা নয় উল্টো উৎপত্তি।

আচ্ছা ব্যাপারটা কী ? তাই তো বটে। বাইরে বেড়াতে গিয়ে যখনি লুনা ওদের দুজনকে কাছাকাছি হতে দেখে বরের দিকে কৌতুক হাসি নিয়ে তাকিয়েছে, সেই হাসির প্রতিদান পায়নি। সুবীর যেন বেজার বেজার মুখে বলেছে, কী এত কথা হচ্ছে। যেদিনকে সেই পিসিমা তারকেশ্বরের মন্দিরে ঢুকলেন পুজো দিতে, বললেন অভী, অলক তোরা আমার সঙ্গে ভেতরে আয়, তোদের নামে মানত আছে। ওরা নেহাত নিরুপায় হয়ে ঢুকল, তার সঙ্গে টুনিও যেই বলে উঠল, 'আমি একটু যাব লুনাদি ? কখনো ভেতরে ঢুকে দেখিনি'—তখন সুবীর কৌতুকের হাসি না হেসে রাগ-রাগ মুখে বলল, কেন তোমারও মানতের পুজো আছে না কি ? ওর ভেতরে ঢুকলে সহজে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে না।' তখন লুনা ভেবেছিল ভিড়ে ঢোকার জন্য বিরক্ত হচ্ছে সুবীর।

আজ এখন লুনা লক্ষ্য করল, সুবীর এই মধুর সুন্দর মজাদার ঘটনাটিকে সমর্থন করে না।

লুনা অবাক হয়ে বলল, 'অসামাজিক' মানে ?

মানে আবার কী ? যেখানে বিয়ে হবার প্রশ্ন নেই—

প্রশ্ন নেই কেন ? লুনা উঠে বসে বলে, আমি তো ঠিক করেছি কালই পিসিমার কাছে প্রস্তাব করব।

প্রস্তাব করবে ? চমৎকার।

সুবীরের সামনে আরশি থাকলে দেখতে পেত মুহূর্তে তার মুখের পেশীগুলো বিকৃত হয়ে গিয়ে মুখটা কীরকম কুশ্রী করে তুলল।

কিন্তু আরশি কি আদৌ ছিল না ওর সামনে? তাতে কি ছায়াটা পড়ল না?

সুবীর সেটা ধরতে পারল না বলে মুখটা আরো পেশল করে তুলে বলল, প্রস্তাব করলেই অমনি পিসিমা রাজি হয়ে যাবেন, কেমন?

লুনার রাগ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে তার মণ্টিমাসির প্রেস্টিজের প্রশ্ন। বলল, কেন? রাজি না হবার কী আছে? টুনি তোমার ভাইয়ের পাত্রী হবার যুগ্যি নয়?

যুগ্যি-অযুগ্যির কথা নয়, এ বিয়ে কী করে হতে পারে, যখন এক জাত নয়।

জাত!

লুনা অবাকস্য অবাক হয়ে বলে, তুমি এসব মান?

আমি মানি না মানি, পিসিমা মানেন।

সে ম্যানেজের ভার আমার।

শুধু পিসির ব্যাপারই নয়, টুনির আত্মীয়রা রাজি হতে যাবে কেন? ওরা বামুন না?

লুনা আরো ক্রুদ্ধ।

আহা! ভারী একেবারে আত্মীয় রে। মরে গেলে খোঁজ নেয় না, আবার আত্মীয়।

সুবীর একবগগার মত বলল, তা হলে কী হবে, ওদের বংশের মেয়ে। ওদেরই দাবি। তুমি এনে একটু আদর যত্ন করছ বলে তো আর তোমার ওর ওপর অধিকার জন্মায়নি?

লুনা সন্দেহের গলায় বলল, তুমি হঠাৎ বিপক্ষের উকিলের মত কথা বলছ কেন বল তো? মনে হচ্ছে যেন বিয়ের সম্বন্ধে ভাঙচি দেবার মতলব।

ভাঙচি আবার কী? বিয়ের সম্বন্ধে কোনো কথাই উঠতে পারে না। তুমি ওদের মেয়েটাকে হাতে পেয়েছ বলে তাকে একটা অন্য জাতের লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বসবে এটা বেআইনী।

লুনা আবার বসে পড়ে বলে, দেখ তোমার আজকের কথাবার্তা আমার

ভাল ঠেকছে না। তুমি কি চাও না বেচারি টুনির, তোমার ওই দামী ভাইটির সঙ্গে বিয়ে হোক ?

দামী! হঠাৎ ফেটে পড়ে সুবীর!

বলে ওঠে, ওই রাস্কেলটাকে তুমি যত দামী ভাব, আমি তা ভাবি না। নেহাত পিসির ছেলে, আর তোমাদের সকলের পেয়ারের, তাই সহ্য করে যাই। নইলে যখনই হিরো সেজে গাড়ির চাবি নাচাতে নাচাতে আর নিজে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়ায়, তখনি ইচ্ছে হয় ঘাড় ধরে বার করে দিই।

লুনা প্রায় ছিটকে উঠল। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, কী বললে ? ঘাড় ধরে বার করে দিতে ইচ্ছে করে ? হ্যাঁ দেখলে মনে হয় বটে ওকে যেন তেমন লাইক করছ না। আগের ভাব আর নেই। তাই বলে এত আক্রোশ ? কেন বলতো তোমার থেকে ধনবান আর গাড়িবান হয়ে গেছে বলে ? তুমি তো এমন ছিলে না।

সুবীর কী অপ্রতিভ হল ?

তাই কী হয় ? কেউ যখন আত্মধ্বংসের পথে পা দেয়, পিছলে নেমে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু গতি থাকে না। আর তখন তার ন্যায়-অন্যায় বোধও থাকে না।

তাই সুবীরও উল্টো চাপের ভঙ্গিতে বলে উঠল, তুমিও এমন ছিলে না। না হলে আমায় সন্দেহ করছ, পাজিটা কিছু টাকা করে ফেলেছে বলে আমি ওকে হিংসে করছি। তুমি জান ও সেই আগের অভী আছে কি না, ওর ক্যারেক্টার ঠিক আছে কিনা, ও মোদো-মাতাল হয়ে গেছে কি না ?

লুনা বোকা, লুনা সরল বিশ্বাসী কিন্তু লুনার মধ্যে একটি সত্যদৃষ্টি আছে। লুনা তাই স্থিরদৃষ্টিতে বরের ওই কুটিল মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে আরো স্থির গলায় বলে, জানি।

কী জান শুনতে পাই না ?

কেন পাবে না ? আমি জানি, ও সেই আগের অভীই আছে এবং থাকবে। কারণ ওর মনের মধ্যে কোনো পাপ ঢোকেনি। আমি জানি, ওর চরিত্র যথেষ্ট রকমের ঠিক আছে, আর মোদো-মাতাল হওয়া যদি তোমার পক্ষেও কখনো সম্ভব হয়, ওর পক্ষে হবে না। মোদো-মাতাল! কথাটা বললে কী করে ? ছি ছি!

সুবীরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। লুনার মুখে এই কথা। ওই বদমাশ শয়তানটা এইভাবে সবাইকে কব্জা করে ফেলে বসে আছে।

সুবীর খাট থেকে নেমে পড়ে প্রায় অগ্নিমূর্তি হয়ে পায়চারি করতে করতে পাঁচনগেলা গলায় বলে ওঠে, বটে! এত বিশ্বাস? এত ভালবাসা?

হ্যাঁ। এত বিশ্বাস, এত ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা।

ফাস্ট্‌ক্লাশ। ঠিক সিনেমার নায়িকার মত দেখতে লাগছে তোমায়। মনে হচ্ছে শুধু তোমার বোনই নয়, তুমিও তোমার ওই হিরো মার্কা দেওরের প্রেমে পড়ে গেলে। মেয়েভোলানো শয়তানরা এইভাবেই মেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সর্বনাশ করে।

লুনা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওঃ। তুমি থামবে? তোমার মুখে এইরকম খারাপ খারাপ কথা আর শুনতে পারছি না। তোমার মধ্যে যে এত হিংসে ছিল তা কখনো জানতাম না। হিংসের জ্বালায় তুমি একটা দেবচরিত্র ছেলের চরিত্রে পর্যন্ত কালি ছিটোতে দ্বিধা করছ না। ওরে বাবা রে, উঃ।

লুনার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

সুবীর দেখছে ক্রমেই যেন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে সুবীর। লুনা যেন তাকে নারকী পাতকী ভাবতে বসেছে। সুবীর ওই বদমাশটার কাছেই হেরে যাচ্ছে। সুবীরের নিজেরও বুঝি জানা ছিল না তার মধ্যে এই ভয়ঙ্কর জ্বালাটা ভরা ছিল। এই জ্বালাভরা মন নিয়ে লুনার কাছে ছোট হয়ে গিয়ে বসে থাকবে?

সরে এল। লুনার একটা কাঁধ চেপে ধরে রূঢ় গলায় বলল, ওই লোফারটার সম্পর্কে এত বিশ্বাস কোথা থেকে আসছে? এইসব কাঁচা টাকার দেশে গিয়ে হঠাৎ নবাব হয়ে যাওয়া কাঁচা মাথাদের মধ্যে কে যে কত ভাল থাকে তা কারো জানতে বাকি নেই। বুঝলে? ওপর ওপর মস্তানি দেখে গলে গিয়ে বুঝে নিলে, ও কী নিধি। লোক চেনা এতই সোজা? অন্যের কথা তো দূরের কথা, বলি আমি 'কী' তাই জান?

লুনার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে বলে, এতদিন জানতাম না। আজ জানলাম।

বলে ঘরের খিলটা খুলে দিয়ে।

কিন্তু যাদের নিয়ে এতগুলো মানুষের মনের মধ্যে এত ভাব-ভাবনার ঢেউ, তারা কোন ঢেউয়ে ভাসছে ?

তারা তো এখনো আর নতুন গাড়ি আনার ছুতোয় এন্তার বেড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে না দঙ্গলে মিশে। কে আবার কত বেড়াবে ওইসব হাতের কাছের ছোট ছোট পচা পুরনো জায়গায় ?

যতই তুমি কবিত্ব করে বল, 'দেখিতেছি আজ চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ঘাসের ডগার উপরে একটি শিশিরবিন্দু।'

কাব্য, কাব্যই।

শিশিরবিন্দুটি একটু রোদের আঁচে শুকিয়ে উবে যায়। ঘাসের ডগাও বিবর্ণ।

রোজ রোজ কে যাবে পরের শখের তালে তাল দিতে। পরের আহ্লাদের পানসিতে গা ভাসাতে ? রোজ রোজ পিকনিক ? এত কারো ভুতে পায়নি।

মা যে মা, সেও বলে, রক্ষে কর বাবা ! আর বেড়াতে যাবার ধুয়ো তুলিসনি। কাজকর্ম মাথায় ওঠে। আর মনে মনে বলে, বেড়াতে যাওয়া মানেই তো ওই ছুঁড়ির সঙ্গে চোখাচোখি মাখামাখির জুত হওয়া !

ভাই বলে, পড়াশুনো রয়েছে দাদা। সামনে পরীক্ষা। এবং সেও মনে মনে বলে, দল জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কতটুকুই বা লাভ দাদা ?

তেলের দাম ওঠে ?

লুনা বলে, আমি তো ভাই একপায়ে খাড়া আছি। হাওয়া গাড়ি দেখলেই তো প্রাণে আহ্লাদের হাওয়া হয়। কিন্তু তোমার ওই নি-সেধো সুবীরদাটি ? এমন ভাব করে, যেন জগতের যত হ্যাংলারাই পরের গাড়ির নামে নাচে। আপন-পর জ্ঞানটা দেখছি বড্ড বেড়েছে আজকাল।

তা সেও মনে মনে বলে, কী করব বল, যতক্ষণ না তোমার মন টার্গেট-টিকে বেপরোয়া গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পাশে বসিয়ে হাওয়া হবার ছাড়পত্রটি না পাচ্ছ, ততক্ষণ আর কী করা ?

কাল পর্যন্ত এইভাবেই ভেবেছে। যতক্ষণ না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এসেছে।

আর টুনি ? টুনি মুখেও যা বলে মনে মনেও তাই। বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এত দুর্দান্ত এনার্জি কার আছে বাবা।

তবে মনের আরো গভীরে কী বলে কে জানে।

কিন্তু একেবারে প্রথম দিকে? যখন সকলেরই এনার্জি প্রবল, তখন? তখন হঠাৎ হঠাৎ একা হওয়ার সুযোগে যে সব ছোট ছোট কথা চাষ হয়েছে, তাতে কি ফসল ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিল?

কেবলই শুনি টুনি টুনি! যদিও খুবই সুইট! তবু—তবু পোশাকি একটা নাম অবশ্যই আছে?

আছে। ছিল। স্কুল-কলেজের খাতায়।

তা সেই খাতায় নামটাই শুনি না একটু।

খুব অর্ডিনারি। মহাশ্বেতা।

ওরে শ্বাস! বৃথা সময় খরচ। প্রতিবার ডাকতে, সময়ের অনেক অপচয়। টুনি ভাল।

আচ্ছা আপনি কোথায় কোথায় গেছেন?

কোথায় কোথায়? শুনে হাসবেন না। বাবার চাকরিসূত্র ছাড়া আর কোথাও নয়। সেগুলো হচ্ছে দুর্গাপুর, বার্নপুর, আসানসোল, তারাপুর। ব্যস।

খুব দূরে দূরে বেড়াতে ইচ্ছে করে?

খু-ব। মনে হয় কোথায় না কোথায় চলে যাই।

আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে কলকাতা। কলকাতা ছেড়ে থাকা যে আমার পক্ষে শাস্তিতুল্য। আপনি বই পড়তে ভালবাসেন?

খু-ব।

কী ধরনের বই?

মুখ্যু লোকেরা আর কী ধরনের বই পড়বে? গল্প, উপন্যাস, কবিতা।

কবিতা ভালবাসেন?

বাসি। সেগুলো বুঝতে পারি।

সিনেমা দেখতে নিশ্চয় খুব ভালবাসেন?

কেন, এতে এমন নিশ্চয়তা কেন?

সব মেয়েরাই তো সিনেমাভক্ত।

অনেক অনেক মেয়ে কোথায় দেখলেন?

পৃথিবীতে তো চরে বেড়াচ্ছি কম দিন নয়।

তা এইসবকে যদি প্রেমালাপ বলে তো প্রেমালাপ!

গাড়ির তেল পুড়িয়ে মাইল মাইল বেড়িয়ে এইটুকু উশুল।

'তবু গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।'

সবাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই দুটো নিশ্চিন্ত ছেলেমেয়ের ওপর। কেউ পাহারার চোখে, কেউ কৌতুকের চোখে, কেউ হিংস্র চোখে।

যাক এখন তো বেড়ানো বন্ধ। এখন অভীক গাড়ি নিয়ে ঘুরছে কলকাতার মধ্যে বা কাছাকাছি একটা ভবিষ্যযুক্ত চাকরির আশায়।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউই কিন্তু ওর এ মতিবুদ্ধির সমর্থক নয়। সকলেরই বক্তব্য, দেখলাম অনেককে। 'দেশে থাকব' বলে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে থাকে কিছুদিন, তারপর আবার চলে যায়। এখানে সে স্কোপ কোথায়?

আবার অনেকে আড়ালে বলে, কী জানি, সেখানে কোনো গন্ধ আছে কিনা। মুখে তাই বলে বেড়ানো হচ্ছে 'দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল'।

তা সে যাক। লোকে তো যা খুশি বলতেই আছে। লোকের কথায় কে কান দিতে যাচ্ছে।

তা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে কি অভীক নামের ছেলেটা আর তার ভালবেসে ফেলা মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবারও সময় পাচ্ছে না?

তা বলে তা নয়। খুব সময় পাচ্ছে। সুযোগেরও অভাব নেই। এমনিতেই তো লুনা নামের মেয়েটা, (যেদিন পর্যন্ত তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত) যখন তখনই তার দুই তুতো দেওরকে নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছে। অথবা নিজেই গিয়ে বলে আসছে, পিসিমা, আজ আমার দেওররা আমার ওখানে খাবে, ইলিশের নতুন দু-তিনটে রান্না শিখেছি। পিসিমা, আজ আমার দেওররা আমার ওখানে বিকেলে চা খাবে, মাংসের কচুরি বানাব। পিসিমা আজ রাত্রে ওরা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে খিচুড়ি খাবে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যায় যেন। মটরশুঁটির খিচুড়ি রাঁধব। আমার মার মত।

তা এসব আমন্ত্রণে দেখা না হবার কোনো প্রশ্ন নেই। লুনার শাগরেদ তো সর্বদাই লুনার সঙ্গে সঙ্গে।

নিমন্ত্রিতরা অবশ্য ভাবে, সুবীরদা আজকাল যেন কেমন হাঁড়িমুখো হয়ে গেছে। খুব বোধহয় নামডাক হচ্ছে, তাই অহঙ্কার হয়েছে। শিল্পী-টিল্পিদের এই এক রোগ। একটু প্রশংসা পেলেই অহঙ্কার এসে যায়।

আগের সেই হাসিখুশি ভাবই নেই।

ভাবে একথা। তা বলে তাতে নিজেদের হাসিখুশির তারতম্য হয় না। হবে কেন? নিজেরাই যে একাই একশো।

তাছাড়া এমন কথা তো টের পাচ্ছে না বাড়ির কর্তা, তখন নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজনকে ঘাড় ধরে বার করে দেবার, পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবার এবং এক ঘুষিতে হাসির বারোটা বাজিয়ে দেবার মহৎ ইচ্ছে পোষণ করছে।

এছাড়া যখন-তখন যেতে-আসতে, ঢুকে পড়ে লুনা বউদিকে ডেকে বলে ওঠা, বউদি বেকার হতভাগা দেওরটাকে একটু চা খাওয়ান। চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে গলা শুকিয়ে গেছে।

তা চায়ের টেবিলে দুটো বাক্য বিনিময়. একটু দৃষ্টি বিনিময় এটুকু আর হবে না। এ ত হয়েই চলেছিল।

তা এ সবই 'সেই রাত্রির' আগের ঘটনা।

পরদিন সকালে লুনা এ বাড়িতে এসে বিনা ভূমিকায়, বলে উঠল, পিসিমা, আপনি তো বলেইছিলেন, টুনিকে আপনার বউ করতে ইচ্ছে করে। তো করুন না পিসিমা।

পিসিমা ছেলের মার ভঙ্গিতে এসে গেলেন। বললেন, ইচ্ছে তো করে। জাত-গোত্তরের কথাও তত ভাবছি না, তবে অভী তো, এখন বলছে, একটা ভালমত কাজকর্ম না পেলে বিয়ে করবে না। লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা! সেখান থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে সাধছে। আর এখানে উনি। তা হোক ওর একটা কিছু. তখন কথা!

তা কথা দিচ্ছেন তো?

কথা দেওয়া-দিয়ি আর কী। ভগবানের ইচ্ছে থাকলেই হবে।

আচ্ছা পিসিমা তাহলে যাচ্ছি।

ভগবান দেখানোর পর, আর কোন কথা দাঁড়াবে?

কিন্তু সুবীর সামন্ত নামের সেই শিল্পী মানুষটা যে ক্রমশ এমন ছোট হতে থাকবে, তা কে ভেবেছিল?

হয়তো এমনিই হয়। অভিলাষ পূরণে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ কত ছোট নীচ আর নির্লজ্জ হতে পারে তা সে নিজেই কোনোদিন জানত না।

ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে স্বরূপ। লুনাকে নির্লজ্জ আর কটু-কঠোর ভাষায় বিদ্ধ করতে দ্বিধা করছে না সুবীর আজকাল। এবং একদিন অভীককে মুখের ওপর বলে বসেছে, বাড়িটা অভীকবাবুর কাছে বেশ মধুচক্র হয়ে উঠেছে তাই না অভীকবাবু? তবে সর্বদা এমন হানা দিলে একজন অনাত্মীয় মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধে। মুখ ফুটে বলতেও পারে না বেচারি!

বজ্রাহত অভীক বলেছে, ওঃ মাপ করো সুবীরদা, খেয়াল করিনি।

অতএব তার আর এখন এ বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার কাজ পড়ছে না।

কিন্তু অভীকের মার এ খবর জানবার কথা নয়। তিনি কী ভেবে হঠাৎ একদিন নিজেই এসে হাজির। হয়তো ভেবেছেন বেশি 'টান' দেওয়া হয়ে যায়নি তো? ছিঁড়ে যাবে না তো? লুনা যদি হতাশ হয়ে অন্যত্র পাত্র খোঁজে!

যা ভেবেই হোক এলেন।

এসে সামনেই নিজে আপনজনটিকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বলে উঠলেন, এই যে, তুই বাড়ি আছিস, ভালই হয়েছে। আমি বলছিলাম কি, বউমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। আসল কাজ যবে হয় হোক, পাকাদেখাটা বরং সামনের পূর্ণিমায় হয়ে যাক।

পাকাদেখা মানে? সুবীর সামন্ত আকাশ থেকে পড়ে। কার পাকাদেখা? কিসের পাকাদেখা?

পিসি গলা তোলে, তুই যে অবাক করলি সুবো। এ যে সেই সাতকান্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা? বলি বউমা কি তোকে কিছুই বলেনি? অভীর সঙ্গে টুনির বিয়ের কথা বলতে গেল না সেদিন?

কার সঙ্গে কার বিয়ে!

সুবীর আরো গলা চড়ায়। অভীর সঙ্গে টুনির? হা-হা-হা। টুনি যে একটা মুখুজ্জোবাড়ির মেয়ে, তা বুঝি তোমার জানা নেই পিসি? সে যাবে তোমার বাড়ির বউ হতে? হা-হা-হা। সুন্দর দেখে একেবারে মাথা ঘুরে গেছে কেমন?

এই অপমানের পর পিসি নীরবে চলে যাবেন এমন তো হতে পারে না? তিনি যা করবার, তা করলেন। তারস্বরে 'বউমা বউমা' রবে হাঁক পেড়ে।

লুনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে, যাকে বলে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করলেন। যে মেয়েমানুষ আপন ঘরে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন একটা বেকুবের মত কাজ করতে যায়, তার বুদ্ধিকে গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে, আর চিরকালের সম্পর্কটির গোড়ায় একটি বৃহৎ কোপ বসিয়ে দিয়ে ঘরঘরিয়ে চলে গেলেন।

এই ছিন্নতরুতে আর যে কোনোদিন পাতা গজাবে এমন সম্ভাবনা রইল বলে মনে হল না।

তারপর? তারপর আর কী?

আরও একখানি চিরকালের বন্ধনমাল্যও কি চিরকালের মত ছিঁড়ে পড়ে রইল না একপাশে একধারে? এ মালাতেও কি আর কোনো দিন ফুল গাঁথা হতে পারবে? আর কি কোনোদিন একখানি হাস্যোৎফুল্ল মুখ একটা বন্ধ দরজা ঠেলে খুলে ঘরে ঢুকে এসে বলে উঠতে পারবে, 'আসামী হাজির। কী হুকুম হয় স্যার?"

তা বলে লুনা নামের মেয়েটা কি এই ছেঁড়া মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে?

সে আর কজন পারে? কতজনেরই তো এমন ছিঁড়ে যায়। অন্তত লুনা পারবে না। লুনা শুধু আর আগের সেই লুনা থাকবে না। বদলে যাবে। অন্যরকম হয়ে যাবে। বিশ্বাসের বদলে অবিশ্বাস, ভালবাসার বদলে ঘৃণা, এই সম্বল নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবে।

কিন্তু টুনির বাকি জীবনের হিসেব?

যে হিসেবটা কষবার দায়িত্ব যে টুনি নিজেই নিজের হাতে তুলে নেবে একথা কে ভেবেছিল?

পিসি চলে যাবার পর, লুনা যখন ঘরে ঢুকে গিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে মরছিল, তখন টুনি এখানে গোঁজ হয়ে বসে থাকা সুবীরের কাছে এসে বলেছিল বটে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জামাইবাবু। আপনি এখনো পর্যন্ত মনে রেখেছেন আমি বামুনবাড়ির মেয়ে, এ কি কম কথা? আমি তো নিজেই ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। তা যাক, যাই ভাগ্যিস মনে রেখেছিলেন, মস্ত দরকারের সময় ওই মনে থাকাটা আপনার ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করল কী বলেন?

সুবীর একটু থতমত খেয়ে বলল, মানে?

ও মা! আমি বোঝাব আপনাকে মানে? তবে লুনাদিটা তো বোকা আছে, কেঁদে মরবে, এই যা!

কথার সুরটা যেন কেমন কেমন?

সুবীর বোকার মত বলল, তার মানে?

এই দেখুন আবারও মানে?

বা রে। হঠাৎ এরকম কথা? ঠিক বুঝলাম না তো।

কতরকম কথাই কত হঠাৎ হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে জামাইবাবু। দেখে হাঁ হয়ে যেতে হয়। যাক আপনাদের এই ছোট্ট সুন্দর একটি কবিতার মত সংসারে শনির মত এসে সব কিছু তচনচ করে দিয়ে গেলাম, এই যা দুঃখ। কী করব, আমার নিয়তি। হয়তো বা আপনাদেরও।

সুবীর ছিটকে উঠে বলল, গেলাম মানে?

না, কেবলই আপনাকে মানে বোঝাতে বসতে হবে? কী মুশকিল। এত সোজা ব্যাপার, তবু বুঝে উঠছেন না?

টুনি হেসেই বলল, তা যাক আপনি-ততক্ষণ মানে ভাবুন, আমি একটু গুছিয়ে নিইগে!

গুছিয়ে নিই গে।

সুবীর স্রেফ তেড়ে উঠে বলল, গুছিয়ে নিই। এরই বা কী মানে? যাচ্ছ কোথায়? অ্যাঁ?

টুনি বলল, কেন, যেখানে যাবার। যেখানে যাওয়াই এতদিন উচিত ছিল! আমার সেই চিরকালের বামুনবাড়ি। যারা আমার মালিক, আমার ভালমন্দের দাবিদার।

সুবীর বলল, বাজে কথা রাখ তো। কাদের বাড়ি যেতে যাবে? কে তোমায় চেনে? তুমি বা কাকে চেন?

টুনি বলল, চিনতে আবার কে কাকে পারে? দুর্গা বলে বেরিয়ে তো পড়া যাক। তারপর চেনা যাবে ধীরে ধীরে।

পাগলামির অর্থ? কে তারা? কোথায় থাকে?

কে তারা, ঠিক না জানলেও, কোথায় থাকে তা জানা আছে। ঠিকানাটি যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম।

কে তোমায় যেতে দিচ্ছে?

সুবীর চড়া গলায় বলল, কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না।

টুনি খুব শান্ত গলায় বলল, কেন বলুন তো? কোনো সদ্‌ব্রাহ্মণ পাত্র যোগাড় করে রেখেছেন নাকি?

টুনি।

সুবীর হঠাৎ গভীর গাঢ় গলায় বলে উঠল, তুমি কি বুঝতে পারনি টুনি কেন আমি এভাবে তোমাকে—

টুনি বলল, বুঝতে পারব না কী বলুন? এত বোকা নাকি? বুঝতে পেরে গেছি বলেই তো পত্রপাঠ বিদায় নিচ্ছি।

না, আটকানো গেল না তাকে।

সুবীর মান খুইয়ে লুনার শরণও নিতে গেল, বলল, এই দ্যাখো তোমার বোন কী পাগলামি করছে। ওর সেই জ্যাঠা কাকাদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। নাও এখন কী করে আটকাবে আটকাও!

লুনা ডুকরেও উঠল না, বোনকে জড়িয়েও ধরল না 'যেতে নাহি দিব' বলে। শুধু শুকনো মুখে বলল, আটকাতে যাবার মুখ থাকলে চেষ্টা করতাম।

বাঃ। অনর্থক গালমন্দ করে বকে গেল পিসি, আর ইয়ে—

দোহাই তোমার, একটু চুপ করো। ও যেখানে যাচ্ছে যেতে দাও।

অতএব চলেই গিয়েছিল টুনি ঠিকানা দেখে খুঁজে খুঁজে তার সেই ঝামাপুকুর লেনের কাকাদের বাড়িতে! যেখানে টুনি নামের মেয়েটা চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। কেউ না তার সন্ধান পায়।

কিন্তু হারিয়ে যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়?

'খুঁজে বার করবই' প্রতিজ্ঞা নিয়ে যদি কেউ খুঁজতে বেরোয়?

একই শহরের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো একটা লোক তুচ্ছ ওই লেনটা খুঁজে পাবে না?

টুনি বলল, কিন্তু অভীদা আমি যে হারিয়েই যেতে চাই। যে সুন্দর সংসারটি আমার নিয়তির আগুনে ধ্বংস হয়ে গেল, তার ভস্মস্তূপের দর্শক হয়ে থাকতে পারব না। আমায় ছাড়ুন।

ছাড়ার প্রশ্ন নেই। এখানে তো থাকতে হবে না। তোমায় অনেক অনেক দূরে নিয়ে চলে যাব তো।

বাঃ। তা কী করে হবে? এই যে বললেন, অনেক চেষ্টায় বিড়লাপুরে না কোথায় ভাল একটা চাকরি পেয়ে গেছেন?

পেতে অনেক চেষ্টা লেগেছে বটে, ছাড়তে তা লাগবে না।

কিন্তু অভীদা! আপনার কলকাতা?

কলকাতা থাকবে কলকাতাতেই।

আপনার প্রাণের কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, কফি হাউস, বইমেলা—

তারা প্রাণের মধ্যেই জম্পেশ হয়ে বসে থাকবে।

কিন্তু এতর বদলে, কতটুকু কী পাবেন অভীদা?

অভীক বলল, সে হিসেবটা তো এক্ষুনি কষে ফেলা যাবে না। সারা-জীবন ধরে কষে চলব।

তথাপি

বাস আর ট্রাক লরীর দৌলতে, 'গণ্ডগ্রাম' শব্দটা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অন্তত লোপ পেতে বসেছে। একথা অবশ্য বলছিনা গণ্ডগ্রামগুলি ক্রমেই শহর হয়ে উঠছে সরকারি 'উন্নয়নের শপথ'-এর পরিচয় বহন করে। 'শহর' হয়ে ওঠার কথা ওঠেনা! সে তার দৈন্য দুর্দশা, অভাব অসুবিধে, নিরুপায়তা অসহায়তা নিয়ে আপন আপন জায়গায় ঠিকই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, লোপ পাচ্ছে, তার নিজস্ব যে একটি চরিত্র ছিল, সেইটি। যে 'চরিত্রের' মধ্যে এই সব দৈন্য দুর্দশা, অভাব অসুবিধের মধ্যেও খানিকটা আদিম আরণ্যের লাবণ্য ছিল, নির্বোধ সন্তোষের শান্তি ছিল।

গ্রামের সেই নির্বোধ সন্তোষের শান্তিটি ঘুচে যাচ্ছে, নিত্য দুবেলা বাস ট্রাক লরীতে চেপে আসা শহুরে ধুলোর দাপটে। ধুলোর আস্তরণ পড়ে যাবে আরণ্যের লাবণ্যের উপর, নিভৃতির শান্তির ওপর।

গ্রাঁমের কিছু কিছু ভাগ্য-সন্ধানী বাসে চেপে চেপে শহরের পথে পা বাড়ায়, আর ভাগ্যকে আহরণ করে আনতে পারুক না পারুক, আহরণ করে আনে কিছু কিছু শহুরে ধুলো জঞ্জাল।

অপরপক্ষে আবার কিছু কিছু শহুরে সুযোগ সন্ধানীরা ওই বাসে ট্রাকে লরীতে চেপে চেপে চলে এসে, ঠিক চিনে বার করে ফেলে, কোনখানে বসিয়ে দেওয়া যায় তার অভীষ্ট সিদ্ধির থাবা। সেই আসার সঙ্গে সঙ্গে তারাও পায়ে পায়ে নিয়ে আসে এই শহুরে ধুলো। যারা আসে, তারা অবশ্য তাকিয়ে দেখে না, কী পরিমাণ ধুলো জঞ্জাল বয়ে আনছে তারা তাদের জুতোর তলায়। তারা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির থাবাটি ঠিকমত জায়গায় বসিয়ে গ্রামের বুক খামচে, উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে তার জীবনীরস, তার প্রাণ সম্পদ, তার নিস্তরঙ্গ নিভৃতিটুকু। ট্রাক লরী বাস, এরাইতো ওই সব সুযোগ সন্ধানীদের পরম সহায়ক। গণ্ডগ্রামগুলির বুক পাঁজর ভেদ করে

ঢুকে ঢুকে পড়বার জন্যে, আদাজল খেয়ে পারমিট জোগাড় করছে, নিত্য নতুন নম্বরের বাসদের দেখা যাচ্ছে ধারে কাছে।

গ্রামের আদিম আরণ্য (তখনো যেটুকু যা থেকেছে) উল্লাসে উৎসাহে দুহাত তুলে নৃত্য করছে, 'আমাদের এই গেরামেও বাস গাড়ি আইছে গো।'

এবং বেহুঁশ হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গ্রামের জলমাটি আকাশ বাতাসের দাক্ষিণ্যে যেখানে যা কিছু যতটুকু উৎপন্ন হচ্ছে, তার সবটুকু চেটে পুটে লুঠে কুড়িয়ে, ঝুড়ি ঝোড়া বস্তা থলিতে বোঝাই দিয়ে, ওই ট্রাক লরীদের বুকে কোলে মাথায় চাপিয়ে, চালান করা হচ্ছে 'সর্বগ্রাসী' শহরের দিকে।

প্রথমে যাচ্ছে ওই সব গণ্ডগ্রামদের লাগোয়া ছোট শহরের পায়ে আছড়ে পড়তে, তারপর আবার পরম আশ্রয় রেল গাড়িতে উঠে পড়তে।

শহরের এমনি বুভুক্ষা যে, কাঁচালঙ্কাটি থেকে নোনা আতাটি পর্যন্ত সবই সে তার বুভুক্ষার আগুনে আহুতি দিতে, পরম আগ্রহে নিয়ে নেয়। আর আরো নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে অভাগা গণ্ডদের লোভের আগুন বাড়িয়ে চলে। বাড়বে না লোভ? চৌদ্দ, কেন চৌষট্টি পুরুষ ধরে, অথবা আরো কত পুরুষ ধরে তারা শুধু কাঁচা সবজি কাঁচা ফলই দেখে আসছে 'কাঁচা-টাকা' দেখেছে কখনো?

এই লুটপাট করে নিয়ে যাবার প্রথম ভূমিকা ছিল অবশ্য রেলগাড়িরই। রেলগাড়ি ভূমিষ্ঠ কালে তো আর তার কনিষ্ঠরা ভূমিষ্ঠ হয়নি? তার এই ছুটকো ছোঠকা ভাইয়েরা! বাস, ট্রাক-লরী-টেম্পো।

রেলগাড়ি এমন করে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে যেতে পারতো না। তার চাল আলাদা, তাল আলাদা। লাইন না হলে তার চলা চলে না। কাজেই তার জোগানদার ছিল সেই সনাতন ভারতবর্ষের আদি ও অকৃত্রিম গোরুরগাড়ি। তা গোরুরগাড়ি তো আর ট্রাক লরীদের মত, এমন ঝড়ের বেগে এসে, রাতের ফোটা ফুলটিকে পর্যন্ত উপড়ে নিয়ে গিয়ে তাজা থাকতে থাকতেই—শহরের পাদপদ্মে সমর্পণ করতে পারতো না। পারতো না বলেই, তখনো পর্যন্ত গন্ডগ্রামের চেহারা চরিত্রটি এমনভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তখন গ্রামের ছেলেপুলেরা গাছে চড়ে ফল খেয়ে পেট ভরিয়ে বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে চাইত না, গ্রামের গোরু ছাগলরা তলায় পড়ে থাকা ফল পাকুড় খেয়ে মাড়িয়ে অবহেলা ভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। গাছপালাদের তলায় তলায় জমে থাকতো আধ খাওয়া, পায়ে মাড়ানো ফল-টলেদের

ধ্বংসাবশেষের জঞ্জাল। তার ওপর জমতে থাকতো শুকনো পাতারা। বাস লরীদের সমবেত সৌজন্যে ওই গাছতলাগুলিও ক্রমশঃ সাফ, সুৎরো হয়ে চলেছে। ঝরে পড়া সজনে ফুলগলি থেকে' ঝড়ে ওড়া নিমপাতাগুলি পর্যন্ত তো এখন সেজে-গুজে ভবিষ্যদ্বক্ত হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠছে। বকফুল, কুমড়ো ফুল, বেত ফুল, করঞ্জা ফলরা পর্যন্ত ক্রমশ সামাজিক নেমন্তন্ন পেয়ে, পরিপাটি প্যাকেটে মোড়াই হয়ে গিয়ে গাড়ি চাপছে।

গোরুরগাড়ি এতো পেরেছে ?

কিন্তু তা' বলে গোরুরগাড়ি কি অবহেলার কবলে পড়ে অভিমানে বিদায় নিয়েছে ?

না না, তাই কখনো সম্ভব ?

সনাতন ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য ভারটি তা'হলে কে বহন করবে ? যে গোরুরগাড়ী স্মরণাতীতকাল থেকে যুগ যুগান্তরের পথপার হয়ে, ক্লান্ত আর্তধ্বনি তুলতে তুলতে চলে আসছে। আসতে আসতে এসে পড়েছে, এই রকেটের যুগেও।

শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন তার এই অনন্ত যাত্রার কোনো সত্যিকার শরিক নেই। কোথায় যেন পাহাড়ি পথে, অন্য দু চারটে কোনো প্রাণী, মাল বইছে, কী মানুষটানুষ বইছে, সেটা ধর্তব্যই নয়। গোরুরগাড়ি এই মহান ভারত ভূমিতে 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।'

তবে সহাবস্থানের পরম দৃষ্টান্তের পরমতীর্থ আমাদের এই সোনার দেশটি ! এখানে একই সঙ্গে গোরুরগাড়ি, আর হেলিকপ্টার, মার্কসবাদ আর মাদুলী !

অতএব গোরুরগাড়ি আছে, থাকবে।

তাছাড়া তার অবলুপ্তির ক্ষীণতম সম্ভাবনার পথটিও আগলে ফেলে, দাঁড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক নির্বাচনের প্রতীক চিহ্নের গৌরবে।

'ভোটদিন গোরুরগাড়িকে।' তা' না দিলেন তো দিন 'জোড়া বলদে।' তাও না দেবেন তো, দিন 'গাই-বাছুরে।' তা' থেকেও যদি পিছুলে পড়েন তো, আঁকড়ে আঁকড়ে ধরুন 'গোরুরগাড়ির চাকাখানাও।'

· · দেশের উদ্দাম গতির মানসিকতায় যখন গোরুর গাড়ির প্রতি দেখা দিচ্ছিল কিছু কিঞ্চিৎ অনীহা আর অবজ্ঞা, সেই মহামুহূর্তে গোরুরা আর গোরুরগাড়ি টাড়িরা ফট করে রঙ্গমঞ্চে উঠে পড়ে ডাক দিয়ে বলে উঠল,

'এই যে। এদিকে তাকান। আমি আছি, আদি ও অকৃত্রিম।...ভারতের শাশ্বতরূপের প্রতীক।'

ভোটদাদারা ওকে বেশী করে জাতে তুলে দিয়েছেন।

তবে? ভোটদাতারাই বা ওকে অবজ্ঞা করেন কী করে? গোরুকেই তো প্রকৃতপক্ষে 'জাতীয় পশুর' মর্যাদা দেওয়া হলো বলা চলে।

যখন ওই 'জাতীয়' সঙ্গীত, জাতীয় ফুল, জাতীয় পক্ষী, জাতীয় পশু' ইত্যাদি নির্বাচন হচ্ছিল, তখন কেন যে ওই মহা মহা মাথাওয়ালা নেতাদের এটা মনে আসেনি, এই আশ্চর্য! 'গোরুই আমাদের জাতীয় পশু' হওয়া উচিত ছিল। যাক তখন ব্যাপারটা ওনাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল বলেই হয়ত পরে এই ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা! গোরু তো আমাদের ভারত ভূমির মতই সর্বংসহা, চাহিদাহীন! যেখানে যতই দ্রুত ধাবনকারী দেখা দিক তার জন্যে পাকা সড়ক চাই। গোরুরগাড়ির 'সড়ক' বানাতে লাগে না। এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা দরকাঁচা পুরো কাদা, রাস্তা তো বটেই খানা খন্দ মাঠ বন দিয়েও চলে চলেছে গোরুরগাড়ি।

চলেছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে শাশ্বতের মূর্তিতে, কখনো-বা চালকের হঠাৎ ছাপটি খেয়ে খানিকক্ষণ তড়বড়িয়ে।

এইসব গন্ডগ্রামে, হাসপাতাল হোক না হোক, রুগী নিয়ে হাসপাতাল যাওয়ার অভ্যাসটা হয়ে গেছে। যে ক্ষেত্রে 'প্রো ঠাকুর্দারা' রুগীকে গঙ্গাযাত্রা করাতে যেতেন, অথবা তুলসী তলায় নামাতেন, সেই সব ক্ষেত্রে বহু দূরবর্তী হাসপাতালে ছোটেন রুগী নিয়ে।

তা' যেতে যেতেই যদি ধরা পড়ে রুগীর আর হাসপাতালে যাবার দরকার নেই, তখন মোড় ঘুরিয়ে মড়িপোড়ার ঘাটের পথ ধরতে বললেও গোরুরা নির্বিকার। বলে উঠবে না, 'ওটা আমার রুট নয়।'

বোধহয় এইজন্যেই যুগ যুগ, অনন্তকাল ধরে টিকে আছে এই সর্বংসহা বাহন। ওর জন্যে সড়ক বানানোর প্রশ্ন নেই, রুটের ভাগ নেই।

তবে—

এযুগে ওর এক মহাবলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মে বসে আছে বটে! তারও সড়ক বানাতে লাগে না। যার নাম জীপগাড়ি।

তিলক তালুকদার যখন এ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন গোরুর গাড়ি চেপেই। এতদিন পরে আবার এ গ্রামে পদার্পণ করলেন, তার বলশালী

প্রতিদ্বন্দ্বীতে চেপে। জীপে চড়েই ঘুরতে হচ্ছে তো! এ অঞ্চলে 'সড়ক' বলতে তো কিছু নেই!

গ্রাম ছেড়ে যখন চলে গিয়েছিলেন তিলক তালুকদার তখন তাঁর বয়স ছিলো বারো, এখন বাহান্ন।

চল্লিশ বছর পরে এই পদার্পণটি অবশ্যই দারুণ একটি নাটকীয় রোমাঞ্চে ভরা।

তিলক তালুকদারের সেই একদা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণটি অন্ধকারাবৃত! সেই অন্ধকার উদ্ঘাটনের প্রেরণা তখন কারো মধ্যে দেখা যায়নি, তবে এখন বুড়োদের মহলে সেটা আলোচিত হচ্ছে বটে এক আধটু। সে যাক্ সে কিছু না। আবার ফিরে আসাটার কারণ আলোকোজ্জ্বল।

বিধানসভার নির্বাচনে নেমেছেন তিলক তালুকদার। এই জেলা থেকে।

জেলার নামটি তো বলা যাবেই না, গ্রামের নামটাই বা উহ্য থাকলে ক্ষতি কী? শহুরে ধুলোয় ধূসরিত একদার গন্ডগ্রাম এই জায়গাটার জন্যে না হয় একটা ছদ্ম নামই দেওয়া যাক।

ধরে নিন এই জেলার প্রার্থী তিলক তালুকদারের জন্ম-গ্রামের নাম গগনপুর। যেখানে আজ তিনি পদার্পণ করছেন ভি. আই. পি.র মর্যাদায়।

এই গগনপুরে আজ তাঁর নির্বাচনীসভা।

তিলক তালুকদার তাঁর নির্বাচনী সফরে, ঝড়ের বেগে সভা করে বেড়ালেও, অভিমত প্রকাশ করেছেন, আজ রাত্রিটা এখানে অবস্থান করবেন।

তালুকদারের সঙ্গে চামচা'রা এ প্রস্তাবে শিহরিত হয়ে বলে উঠেছিল, সে কি স্যার! এ যে একেবারে অ্যাবসার্ড কথা বলছেন! ওই পচা পাড়াগাঁয়ে রাত্রিতে থাকা! ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই, ইয়ে নেই, মানে কারোবাড়ি একটা ভদ্রমত বাথরুমও বোধহয় নেই। রাত্রে থাকবেন কী করে? কত আর দূরে আমাদের এই সার্কিট হাউস থেকে? বাইশ তেইশ মাইল্ জীপে্ কতক্ষণ? যত রাতই হোক ফিরে আসা যাবে!

তিলক তালুকদার হেসে বলেছিলেন, যাবে তা জানি। কতদিন আমরা পঁচিশ তিরিশ মাইল ঠেঙিয়েছি। এখানে থাকব বলেই থাকব।

স্যার, আপনার ছেলেবেলার বন্ধু-টন্ধুদের কী আর এখন ঠিকভাবে পাবেন? হয়তো ইয়ে আপনার সঙ্গে মিশতেই আসবে না সাহস করে। বৃথাই আপনি কষ্ট করে—

এই দ্যাখো, ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার বাসনায় থাকতে চাইছি, একথা কে বলল তোমাদের? এমনিই খেয়াল হচ্ছে—

পারবেন না স্যার। অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না—

আসলে 'কর্তা' এখানে থেকে গেলে এই চামচাদেরও রাতটা থেকে যেতে হবে। যে দুঃসহ অবস্থাটি ভেবেই হৃৎকম্প হচ্ছে এঁদের।

তিলক কি আর সেটি না বুঝছেন? আর বুঝে ফেলে মনে মনে না হাসছেন?

তা' মুখেও হাসলেন। সেটা অন্য হাসি। সেই তেল পিছলোনো অমায়িক হাসিটি হেসে বললেন তিলক, একেবারেই বুঝতে পারছিনা ভাবছ কেন হে? জীবনের পুরো একটা যুগ তো এখানেই কাটিয়েছি। বারো বছরেই তো একটা যুগ ধরা হয়, তাই না?

খবরটা আবছা আবছা শুনেছে এরা।

মা বাপ মরা ছেলেটা, অন্য আত্মীয়জনের মায়ায় আটকে না থেকে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সময় সমুদ্রের একটা বিশাল অংশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাড়িত হতে হতে, সেই ছেলে অবশেষে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তা' এমন কত ছেলেপুলের জীবনে ঘটে। তাই বলে, সেই সেণ্টিমেণ্টের বশে এমন একটা উৎকট ইচ্ছে?

সেই আলোকোজ্জ্বল সার্কিট হাউসের দুগ্ধফেননিভ শয্যা, মাথার ওপর ঘূর্ণ্যমান পাখা, শক্ত সামর্থ নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সেই সব ছেড়ে, এই ঝিঁ ঝিঁ ডাকা, মশা ভন ভন নিরাপত্তাহীন অজ পাড়াগাঁয়। ভগবান জানেন কোন বাড়িতে কাদের তেলচিটে বিছানায়—

কেশব আবার শেষ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্যার, যখন থেকেছিলেন, তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থা!

তিলক মহোৎসাহে বলেছিলেন, এখন তো অনেক ভাল অবস্থা! বাস সার্ভিস হয়েছে, গ্রামের মেয়েরা নাকি দল বেঁধে মতিগঞ্জে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, ছেলেপুলেরা ট্র্যানজিস্টার গলায় ঝুলিয়ে সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ এসব খবর একটু আধটু জানা হয়ে গেছে। নির্বাচনী সফরের আগে, জেলার গ্রামাঞ্চলের সম্পর্কে কিছু কিছু সমীক্ষা নিতে হয় বৈকি। ওই সব 'ছেলে-পুলে' সেই প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মত নিরীহই আছে, কিম্বা বর্তমানের হাওয়া গায়ে লাগিয়েছে, সেটা জানা দরকার বৈকি।

কেশব আর কিছু বলল না।

মনে মনে বলল, আচ্ছা! পরে বুঝো ঠ্যালা। সেই রাত্তিরে মানখুইয়ে বলতে না আসা। 'কেশব মনে হচ্ছে বোধহয় তেমন সুবিধে হবে না। জীপটা ঠিক আছে তো?'

ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়ার ব্যবস্থা।

তা তার মধ্যেই গগনপুর থেকে অভ্যর্থনা সমিতির লোক এসে গেছে। একদম ভোরের 'বাজার লরী'তে চেপে।

এঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপাল, আর, বি. ডি. ও অফিসার দেবেশ ঘোষ। সঙ্গে গগনপুরের কিছু উৎসাহী ছেলে। আসলে যারা বেকার অনেক প্রত্যাশা নিয়ে 'প্রার্থী' তিলকদায়ের কাছাকাছি আসতে চাওয়ার প্রেরণায়।

জীপ্ এর মধ্যে কথা বলা তেমন সুযোগ নেই, তালুকদার তো সামনে, চালকের পাশে, পিঠ ঘেঁষে যাঁরা বসেছেন, তাঁরা তো দুই কেষ্ট বিষ্টু; কানাই পাল আর দেবেশ ঘোষ।

অথচ এদের কথা বলাটা বড় দরকার, এই ছেলেদের। যাঁরা নাকি ট্রান-জিস্টার গলায় ঝুলিয়ে সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

পথে একবার থামা হলো। দেখা গেল রাস্তার ধারে একটা লোক একটা গাছের গোড়ায় ভিজে গামছা চাপা দিয়ে এক কাঁদি ডাব নিয়ে বসে আছে, হাতের কাছে কাটারী! কাছে এক ভদ্রলোক রোদ আড়াল করে ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বোঝা গেল এঁদের অপেক্ষাতেই এই দাঁড়িয়ে থাকা।

কানাই পাল বলল, একবারতো কষ্ট করে একটু নামতে হবে স্যার। এরা আপনাকে ডাব খাওয়াবে বলে আশা করে বসে আছে।

গগনপুরেও এখন ডাবের সঙ্গে 'স্ট্র' থাকে, কাজেই গেলাশের অভাবে অসুবিধা নেই।

এই নামার সুযোগে একটা ছেলে কাছে সরে এসে বলে উঠল, আমাদের জন্যে একটু সময় দিতে হবে স্যার।

'স্যার' বলে উঠলেন, এই সেরেছে। সময় কোথায় ভাই! তো কী ব্যাপার?

আজ্ঞে আমাদের ক্লাবে একবারটি যেতে হবে। কী ভাগ্যি বুড়োদের মত বলল না, 'পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

তিলক তালুকদার প্রায় বলে ফেলছিলেন, আরে বাবা, তোমাদের এখানে ক্লাবও হয়েছে এখন ?…বললেন না সামলে নিয়ে বললেন, বেশ তোমরা যদি আমাকে সময় বার করে দিতে পারো, যাবো। রাতটাতো এখানেই থেকে যাবার ইচ্ছে রয়েছে।

রাতটা এখানে।

এই সব ফালতু ছেলেরা খবরটা জানতো না।

বিগলিত হয়ে বলল, তাহলে আজ্ঞে—ইয়ে কোনো প্রবলেমই নেই। এটা তো ধারণা করতেই পারিনি।

কানাই পাল আর দেবেশ ঘোষ ওই ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানো ছেলেগুলোর দিকে শ্যেন্‌ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। এরা আবার কী গুজ্‌গুজ্‌ করছে ? নিশ্চয় চাকরীর কথা বলছে। ব্যাটাদের গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ! লোকটা জিতবে কি না জিতবে তার নেই ঠিক।…তবে হ্যাঁ এর আগের আগের সভা-গুলো, যা আশপাশের গ্রামে করে এসেছিল, তার রিপোর্ট ভাল। সকলেই ওর আন্তরিকতা, সরলতা এবং গ্রামের সুখ দুঃখ সম্পর্কে সহানুভূতির দৃষ্টি দেখে না'কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

যতই হোক এই জেলার ছেলে তো।

ডাব পর্ব সমধা করে আবার জীপ ? ওঠার পর তিলক তালুকদারের চোখে পড়তে লাগল, এখানে সেখানে দেওয়ালে মোটা গাছের গুঁড়ি টুড়িতে সাটা হয়ে রয়েছে তিলক তালুকদারের প্রতীক চিহ্ন গোরুর গাড়ির চাকার ছবির সঙ্গে তিলক তালুকদায়ের ছবি, 'এই চিহ্নে ভোট দিয়ে প্রার্থী তিলক তালুকদারকে জয়ী করুন।' মনটা ভারী প্রসন্ন লাগল। রোদের ঝাঁজ আছে বটে, তবে গাড়ির বেগে হাওয়া কাটছে। তথাপি কানাই দেবেশ বারবার বলছেন, উঃ কী তাতই উঠেছে। আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে স্যার।

তিলক হেসে উত্তর দিচ্ছেন, কষ্ট একা আমারই হচ্ছে ? আপনাদের হচ্ছে না ?

আমাদের কথা বাদ দিন।

উনি বললেন, কেন ? বাদ দেব কেন ? কারো কথাই বাদ দেওয়া চলবে না। দেশের প্রতিটি মানুষের কথাই সমান ভাবে মনে রেখে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কাউকে তুচ্ছ ভাবার কথা ওঠে না।

মাঝে মাঝেই এরকম ভাষণের টুকরো বিতরণ হচ্ছে।

কেশব আর বিশ্বনাথ ভাবছে, সব ভাল ভাল কথা পুরনো করে ফেলছেন কেন কর্তা।

তবে হ্যাঁ, এতো নতুন কথা পাবেনই বা কোথায় ? জেলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে (দৈনিক পাঁচ সাতটিও) যদি সংকল্পের বাণী বিতরণ করা যায় স্টক ফুরিয়ে যাবে না ?

'করবো' আর 'করতে হবে' এই শব্দগুলো কি যথার্থই গভীর বিশ্বাস থেকে উঠে আসছে ?

গগনপুরে পেঁাছেই 'লাঞ্চের'র প্রশ্ন।

না স্নানের কথা ওঠে না। সে তিলক ভোরে সেরে নেন। শুধু কোনোখানের ভাল টিউবওয়েলের জল থেকে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে একটি ভাল বাড়িতে খাওয়া।

তা সেরকম বাড়ি আপনিই এগিয়ে থাকে, রাজকীয় ব্যবস্থা নিয়ে।

এখানে দেবেশ ঘোষই এই এগিযে আসা।

দেবেশের স্ত্রী গ্রামের স্কুলের শিক্ষিকা, দেবেশ ঘোষের বাড়ি পিতৃ-পুরুষের আমলের পাকাপোক্ত দালান।

বাইরের দালানে এ'দের জন্যে চৌকী পেতে ফরাস বিছানো হয়েছে। আবার ভিতর বাড়ি থেকে একটি বড় সোফাও বার করে এনে রাখা হয়েছে। দেবেশ ভাল ঘরের জামাই, বিবাহ সূত্রে পাওয়া আসবাব পত্রে তার স্বাক্ষর।

দেবেশেব বৃদ্ধ পিতা অবহিত হয়ে বসেছিলেন এইখানেই একটি হাতল দেওয়া কাঠের চেয়ারে। সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক, একদা না কি দেশসেবক ছিলেন। দালানের উ'চু দেওয়ালে সারি সারি বিশিষ্ট সব দেশ নেতাদের ছবি টাঙানো।

এ'রা ঢুকতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

দেবেশ নীচু গলায় বললেন, আমার বাবা।

তিলক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দু হাত জোড় করে নমস্কার করে বলে উঠলেন, বসুন বসুন। আপনি উঠছেন কেন ? কী আশ্চর্য

তিলক একবার অসতর্কে সীলিঙের দিকে তাকালেন। তবে সেটা বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়াল না। একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, অনেকদিন থেকেই তো শুনতে পাচ্ছি ইলেকট্রিসিটি আসবে। তো সে আর দেখে যেতে পাবো এমন আশা নেই !

ততক্ষণে কয়েকটা ছোট ছেলে পাখা নিয়ে বাতাস করতে শুরু করেছে। তিলকের দুধারে দুজন। সঙ্গের অতিথিদেরও ধারে কাছে একজন করে।

প্রত্যেকেই হাঁ হা করে তাদের কাছ থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে নিজে হাওয়া খাবার চেষ্টা করল, হলোনা। ছেলেগুলো শক্ত ছেলে।

এরপর বাড়ির মধ্যে থেকে দেবেশের স্ত্রী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে দুটো মেয়ের হাতে দুটো ট্রে। একটায় কাঁচের গ্লাসে গ্লাসে ঘোলের সরবৎ। একটায় প্লেটে প্লেটে মিষ্টি।

বৃদ্ধ ঘোষ, আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, একদা এই গগনপুরের কাঁচাগোল্লা খুব বিখ্যাত ছিল, এখন আর সে জিনিস নেই। সেই সঙ্গে তাঁর বধূমাতার একটু প্রসংশা করে নিলেন। এবং তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেল বৌমা তাড়াতাড়ি! বিকেল চারটের সময়ইতো বেরিয়ে পড়তে হবে এঁদের। একটু তো বিশ্রামের টাইম চাই।

আবারও আক্ষেপ করলেন, এখন আর 'দুধশাল' ধানের চাল এর চিহ্নও নেই এখানে। নেই গোবিন্দভোগও। ভাল চাল আনতে হয় কলকাতা থেকে।

'হয়' মানে আর কি হয়েছে।

খেতে বসে দেখতে পেলেন তিলক, কলকাতা থেকে আরো অনেক কিছুই আনানো হয়েছে। যেমন অসময়ের ফুলকপি, বড় সাইজের গলদা চিংড়ি, চাটনির আলুবোখরা।

তিলক খুব কুণ্ঠিত ভাবে বলতে লাগলেন, আমার জন্য অতো সব স্পেশাল আয়োজন কেন? আমি তো এখানে ঘরের ছেলে।

বৃদ্ধ কথায় হারলেন না। বললেন, ঘরের ছেলে কি আদরের বস্তু নয়? আমার এই কুঁড়ো, আর কবে আপনি খেতে আসবেন বলুন? তো আমার বৌমার রান্নার হাতটি—

কথা শেষ করতে হল না।

তিলক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, অপূর্ব!

কেশব কোম্পানীও হৈ হৈ করে উঠল।

দেবেশ ঘোষ স্মিত হাসি হাসলেন।

খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল ভিতরের দালানে। সারি সারি চটের ফুলকাটা আসন পেতে। সবই পরিপাটি।

দেবেশের বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মেয়ে সাহায্য করছিল। জল দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া।

তিলক বার বার মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিলেন। আগে কি কোথাও দেখেছেন মেয়েটিকে?

খেয়ে ওঠার আগেই বাইরে একজন এসে খবর দিল, অনেকক্ষণ থেকে একটি ছেলে অপেক্ষা করছে তিলকের সঙ্গে দেখা করবে বলে। নাম বলেছে অরুণ তালুকদার।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই ছেলেটি পা ছুঁয়ে প্রনাম করে বলে উঠল, জ্যাঠা-মশাই! আমি অরুণ, তারক তালুকদারের নাতি। দাদু বিশেষ করে বলে পাঠালেন মিটিঙের পর ওখানে চলে আসবেন। আর রাত্রে ওখানেই খেতে হবে।

তিলক তালুকদার একবার শূন্য চোখে ওই ছেলেটার দিকে তাকালেন। তারপর ভাবলেন, সভ্য সমাজে মানুষ কতো অসহায়! অট্ট হাস্যে ফেটে পড়তে চাইলেও, খুব স্থির শান্ত ভাবে থাকতে হবে।

গননপুরের সভাটা খুব জোরদারই হলো। গ্রাম সুদ্ধ লোক তো ভেঙে পড়েইছে পাশের গ্রাম পলাশপুর এবং শাপলা থেকেও লোক এসেছে। প্রধান কারণ। তিলক তালুকদারের ইতিহাস।

তালুকদার বাড়ির সেই কতকাল আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে, আজ একখানা মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। নাজানি কেমন দেখতে হয়েছে সে।

বেশীর ভাগই অবশ্য স্মৃতিতে নেই, শোনা কথা। বুড়োটুড়োদের মনে থাকার কথা। কিন্তু হারিয়ে যখন গিয়েছিল, তখনতো আর সে খবরটায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি। যেটাকে গুরুত্ব দেবার সেটাকেই দিয়েছিল। তা' সেটা আশ্চর্যও নয়।

বাড়ি থেকে একটা বারো বছরের ছেলে হারিয়ে যাওয়া, আর একটা পনেরো বছরের মেয়ে হারিয়ে যাওয়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ নয় কী?

এরকম দুটো ঘটনা পাশাপাশি ঘটলে কোনটায় দিকে বেশী নজর দেবে মানুষ?

তবে হ্যাঁ, তেজারতির কারবার করে খাওয়া তারক তালুকদারের বুকের

পাটা শক্ত বৈ কি। দুদুটো এতো বড় ঘটনা ঘটতেও তাকে বিচলিত হতে দেখা গেলনা।

তিনি পাঁচজনের সামনে উদাস গলায় বলেছিলেন, আমরই ভাগ্য। মা বাপ মরা ভাইপো ভাইঝি দুটোকে মানুষ করলাম, এই ভাবে দাগা দিয়ে চলে গেল! অবিশ্যি মেয়েটাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। ভদ্রঘরের মেয়ে হঠাৎ যদি দেখে শরীরের কুষ্ঠ দেখা দিয়েছে, বিচলিত হতেই পারে। দুঃখ এই চিকিৎসা পত্র করবাব সময় সুযোগ দিল না আমাকে। যেই ধরা পড়ল, সেই কাঁদতে কাঁদতে 'আমি মরব, আমি মরব' বলে ঝড জল দুর্যোগের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আব এলনা। কী জানি কোথায় গিযে প্রাণটা দিল!

কিন্তু তারক তালুকদাব এই আক্ষেপ বাণী পডশীদের যে খুব মনস্পর্শ কবল, তা বলা যায না, ঘটনাটায় সন্দেহও রয়ে গেল। তবে অল্প বিস্তব সকলেরই তো ওই লোকটার কাছে টিকি বাঁধা। মনেব সন্দেহ মনেই থাকল।

রাত ভোব দুর্যোগ গিযেছিল।

সকালে তাবক কাছে পিঠে সব পুকুর তোলপাড করালো লোক লাগিয়ে। তারপর বুক চাপড়াতে লাগল। নাঃ, ধারে কাছে কোথাও ডোবেনি।

বুক চাপডানোব আরো একটা কারণ ঘটল, বাতারাতি ছেলেটাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কখন? কেউ জানে না?

তারক ডবল করে বুক চাপডালো।

সেই তাবক তালুকদাব।

এখনো বেঁচে আছে?

কত বয়েস ছিল তখন?

কত বয়েস থাকলে, তার আরো চল্লিশ বছর বাঁচা যায়?

সভা অন্তে ছেলেরা প্রায় ঘেরাও করেই নিযে এল তিলককে তাদের ক্লাব রুমে।

ক্লাবরুম।

নামটা বেশ মর্যাদাপূর্ণ। কিন্তু এর থেকে উচ্চমানের কিছু কি আশা করেছিলেন তিলক? তবু তাদের উদ্যম আর উৎসাহের প্রশংসা করলেন। তাদের বহু চেষ্টায় যখন এক পেয়ালা চা খেলেন, এবং রসগোল্লা দুটি

মহিলাদের প্রত্যাখান করলেন, এ বয়েসে আর যখন তখন মিষ্টি খাওয়া চলে না বলে।

অতঃপর আসল কথা পাড়ল ছেলেরা। এদের এই ক্লাবরুমটির দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকাতে হবে স্যারকে। আর ভবিষ্যতে তাদের সকলকে একটি করে চাকরী করে দিতে হবে।

তাছাড়া মতিগঞ্জ থেকে গগনপুরের রাস্তাটা ভাল করিয়ে দিতে হবে, আর গ্রামে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিলক হেসে বললেন, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপটা যদি হাতে পেয়ে যাই ভাই তাহলে এর সবই হতে পারে।

সে তো আপনি পাবেনই।

বলে উঠল সবাই।

অর্থাৎ তাদের ধারণা, ভোটে জেতাটাকেই বুঝি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে উল্লেখ করলেন তিলক।

তিলক হাসলেন মনে মনে।

অনেক শহুরে হাওয়া আর ধুলো গায়ে লাগলেও, এমন একটি বিশ্বাস এরা সযত্নে পালন করে চলেছে; ভোটে জিতলেই লোকে সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে।

ছেলেরা বলল, আমরা আপনার জন্যে খাটতে যাই স্যার।

স্যার বুঝলেন আপাততঃ এই 'চাকরী'টিইতে লক্ষ্য এদের। হাসলেন। বললেন, তা তোমরাই তো খাটছো ভাই। পোষ্টার দেখতে দেখতে এলাম।

ওই পোষ্টার দেখার সঙ্গে অবশ্য ওই ক্লাবরুমের ছেলেদের যোগসূত্র ছিল না। ওটা কানাই পালের অবদান। তবু ওরা শুধু একটু স্মিত হাসি হাসল।

তারপর প্রশ্ন তুলল, এ রকম একটা 'প্রতীক চিহ্ন' নির্বাচন করলেন কেন তিলক তালুকদার। 'গোরুরগাড়ির চাকা। এর মধ্যে প্রগতির চিন্তা ভাবনার চিহ্ন কই? জেলায় আর দুজন নির্দল প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন এরোপ্লেন, আর টর্চ। গতি এবং আলোর প্রতীক।

তিলক একটু বিষণ্ণ মৃদু হাসি হেসে বললেন, আসলে কী জানো ভাই গোরুরগাড়ির চাকা আঁকড়েই তো একদিন এই গগনপুর থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম। হাতে পয়সাকড়ির বালাই তো ছিল না; বিনি পয়সায় কে

নেবে বল ? একজন গাড়ি চালকের গাড়ির একটা চাকা চেপে ধরে বসে থাকলাম। দেখি কেমন আমায় না নিয়ে চলে যাও! তো শেষ পর্যন্ত লোকটার মন ভিজল। জগতে ভাল লোকেরও অভাব নেই ভাই।

একথা জানেন তিলক তালুকদার, এই প্রশ্ন কেউ করে উঠতে সাহস করবে না, তা সে তো হলো, কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন কেন ?

না সাহস হবে না ?

ওদের ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল, বোধহয় সারা রাত স্যারকে নিয়ে বসে থেকে, নিজেদের জীবনের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ, সুবিধে অসুবিধের কথা বলে চলে, কিন্তু ওদিকে পেয়াদা দাড়িয়ে।

সেই সকালের অরুণ তালুকদার এসে দাড়িয়ে আছে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে। তার দাদু ব্যস্ত হচ্ছেন।

এদিকে কানাই পালের প্রেরিত লোক পাহারা দিচ্ছে, যাতে বেশী রাত না হয়ে যায়। তার বাড়িতে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা। বাড়িটা অবশ্য একটু দূরে, তা কী আর করা। জীপ তো আছেই হাতের কাছে।

হাঁক বাসের বুড়ো!

চুরাশী পার করেছে।

তবু চৌকির ওপব বসে আছে কোলে বালিশ ধরে ফর্সা জামাকাপড় পরে।

অলক আগে আগে এগিয়ে এসে বলল, বাবা! এই যে এসে গেছেন।

পুলক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাবা বড়দা এসে গেছেন।

তিলক যখন চলে গিয়েছিলেন ঃ পুলক কিছু না পরে ঘুরে বেড়াতো, আর অনেক শ্লেট পেন্সিল নিযে পাঠশালে যাওয়া ধরেছে সবে।

এসে যে রীতিমত একটি নাটকীয় পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, এটা অনুমানই করে নিয়েছিলেন তিলক, কাজেই মনকে প্রস্তুত করেই এসেছিলেন। কিন্তু তাই বলে শয্যালগ্ন তারক তালুকদার যে দুহাত বাড়িয়ে, ভাঙা ফাটা গলায় ওরে আমার হারানো মানিক এসেছিস্। বলে উঠে আসতে গিয়ে পড় পড় হবেন, আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিলককেই ধরে ফেলতে হবে, ওই ক্লেদাক্ত মানুষটাকে।

'তুলে ধরা মানেই তো তার আলিঙ্গনে ধরা দিতে বাধ্য হওয়া।

অর্থাৎ এর সবটাই পরিকল্পিত!

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও না একদা পরম স্নেহে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'আলিঙ্গন' করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তারকও একরকম অন্ধই। পয়সায় অভাবে সদর হাসপাতালে গিয়ে ছানি কাটাতে না পারার জন্যে প্রায় অন্ধ হয়েই পড়ে আছে কতকগুলো বছর। তারক তালুকদার তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুহাতে সাপটে ধরে আরো ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল, রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর পরে অযোধ্যায় ফিরে ছিলেন, আর আমার গগনপুরের রামচন্দ্র রাজ্যে ফিরল চল্লিশ বছর পরে।

রাগে নয়, ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করে উঠল তিলকের। তবু নিঃশব্দে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন মাত্র।

তারক আবার বিছানায় বসে বলল, আয় বাবা, আমার কাছটিতে বোস!

অলক তাড়াতাড়ি বলল, এই যে এখানে চেয়ার রাখা আছে।

বাড়ির বোধহয় একমাত্র একটু ভবিষ্যযুক্ত হাতল দেওয়া কাঠের চেয়ারকে ঝেড়ে মুছে রাখা হয়েছে তারকের চৌকির সামনে। তিলকের দিকে সেটা এগিয়ে দিল অলক।

শুধু কাঠের, তবু বসে বাঁচলেন তিলক তালুকদার। আর ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলেন, এইটাই কি সেই চেয়ারটা, একদা যেটায় বসে তারক তালুকদার সামনের একটা কেঠো টেবিলের ওপর রাখা নিক্তিতে, লোকের বন্ধকী গহনা ওজন করতো। সোনারূপো দু রকমেরই গহনা।

হঠাৎ তারক হঠাৎ জেগে ওঠা ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জে উঠল, অলক, পুলক, বৌমাদের বলে রেখেছিলুম না তিলু আসা মাত্তর শাঁখ বাজাতে। তার কী হলো? কোথায় গেলেন তাঁরা? অ্যাঁ! কী রাজকার্য হচ্ছে? উত্তর পাওয়া গেল না।

বলা বাহুল্য অলক পুলক এবং তাদের বৌরা এই আদিখ্যেতার সঙ্গে তাল দিয়ে অপরাগ হয়েছে।

তিলক বলে উঠলেন, আঃ। জ্যাঠামশাই এরকম করলে তো আমার বসাই সম্ভব হবে না।

তারক ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল, বুড়ো আমার প্রাণটার মধ্যে যে কী হচ্ছে বাবা! উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসলে রাগ করিস না বাপ।

তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বলল, তা ছেলেটাকে একটু চাটা খেতে দেওয়া হবে তো? না কি সে ব্যবস্থাও হয়নি।

তিলক বললেন, না না অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আর চা নয়। ছেলেরা ছাড়ল না, ওদের ক্লাবে ধরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালো।

ছেলেরা মানে? পুলক! ক্লাব আবার কাদের?

ওই তো 'মন্দিরপাড়ার' ছেলেদের।

অ্যাঁ। সেইসব অকালকুষ্মাণ্ড বদ ছেলেগুলো তোমায় কবলে ফেলেছিল? না না। খুব অন্যায়। ওই সব ছেলেরা হচ্ছে পাজীর পাঝাড়া!

পুলক বিরক্তির আর অসহিষ্ণুতার গলায় বলে ওঠে, আঃ বাবা! কী যা তা বলছেন! ওদের আপনি জানেন না চেনেন না—

থাম! থাম! তারক তালুকদারের আর কাউকে জানতে চিনতে হয় না! তো যাক। চা না খাবে তো হাত মুখ ধুয়ে একেবারে খেতেই বসুক। তো বাবা তিলু, বলেই রাখি গরীব জ্যাঠার বাড়িতে পোলাও কালিয়ার আশা কোরো না। তোমার এই দীন দরিদ্র ভাইয়েরাতো আর কলকাতা থেকে অসময়ের কপি কড়াইশুঁটি, গলদা-চিংড়ি এনে খাওয়াতে পারবে না। যেমন ডাল ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছিলি, তেমনি দুটো ডাল ভাতেরই ব্যবস্থা আছে। বলি মুসুরির ডাল হয়েছে তো? বলে রেখেছিলুম, তিলু আমার মুসুরির ডাল খেতে ভালবাসতো।

তিলকের মনে হল তিনি একটা নাটকেব সংলাপ শুনে চলেছেন।

কিন্তু কতক্ষণ সহ্য করা যায় এরকম একটা রদ্দি লেখকের লেখা নির্লজ্জ আর ধৃষ্ট নায়কের জোলো সংলাপ!

মুসুরির ডাল! কী অদ্ভুত একটা শব্দ।

তারক আবার বলে উঠল—বৌমাদের বল, এইখানে আমার সামনে তিলুর 'ঠাঁই' করে দিতে।

শোনামাত্র সারা শরীরের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল তিলকের।

হ্যারিকেনের আলোয় ঘরটার জরাজীর্ণ ক্ষত বিক্ষত দেওয়ালগুলো যেন প্রেতের চোখে তাকিয়ে আছে, মাথার উপর থেকে ঝুলছে লেপতোষক তুলে রাখা বাঁশের চালি, জানালা বন্ধ ঘরটার মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। চোখের সামনে চৌকির তলায় পিকদানী। অলক বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল, বোধহয় খাওয়ার ব্যাপারে তদারক করতে। পুলক অবস্থা বুঝে আবার বিরক্তি প্রকাশ করল, এখানে এই ধুলোর মধ্যে কোথায় খাবেন। চন্দন বড়দা হাতমুখ ধুয়ে নেবেন।

অরুণ নামের সেই ছেলেটা সমানে পিছন থেকে বাতাস করে চলেছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল পাখাটা হাতে নিয়ে।

তিলক একবার বলেছিলেন, জানলাগুলো বন্ধ কেন?

কেন আর!

তারকের ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলা আবার বেজে উঠেছিল, মশার জন্যে। গগনপুরের ডাকসাইটে মশার খবর তো তোমার অজানা নয় বাপ।

তিলকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, আমার যে 'অজানা' ছিল না, এটা আপনার জানা ছিল?

কিন্তু সংবরণই তো শিক্ষা।

ভিতর দালানে ঢুকে, অকস্মাৎ মনটা যেন হোঁচট খেল তিলক তালুকদার নামের লোকটার

কী আশ্চর্য!

চল্লিশ বছর যাবৎ একই ছবি ধরে রাখতে পারে কোনো দালান রোয়াক উঠোন, কুয়োতলা।

শুধু আর একটু শ্যাওলা পড়া, আর একটু খাপরি ওঠা, আর একটু কোণ ভাঙা। উঠোনে নামার এই সিঁড়ি দুটোর ধারিগুলো একটু ভাঙা ভাঙা ছিল, আর একটু বেশী ভেঙেছে। কিন্তু আশ্চর্য, কুয়োতলার ওদিকে যে মাটি নিকোনো তুলসী মণ্ডটা ছিল, সেটা ঠিক তেমনিই আছে। মণ্ডের উপর তুলসী গাছের ঝাঁকড়া মাথাটাও তেমনি ঝাঁকড়া।

কেবলমাত্র দারিদ্রই বোধহয় এইভাবে একটা ছবি ধরে রাখতে পারে। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের জীর্ণ ছবিটি জীর্ণতর হলেও অবিকল অপরিবর্তিত। দাওয়ার ধারে হাতমুখ ধোবার জলের বালতিটি পর্যন্ত একই খুঁটির ধারে বসানো। হ্যারিকেনের কাঁচ খুবই পরিষ্কার, আলোও এ পরিবেশে মানানসই।

দালানের মাঝখানে একখানি চটের ফুলতোলা আসন পাতা। সামনে ভাত বাড়া।

ভারী কাঁসার গ্লাসে জল, বড় কাঁসার থালায় ভাত। পাশে পাশে তেমনি ভারী ভারী বাটি। বোঝা যাচ্ছে সিন্ধুকের তোলা বাসন বার করা হয়েছে। তাই ঝকঝকে ভাবের অভাব।

দুটি ঘোমটা দেওয়া বৌ আস্তে এসে প্রণাম করল পা না ছুঁয়ে। পরনে আধময়লা আধময়লা শাড়ী।

এই যে বড়দা আপনার বৌমারা।

তিলক অস্বস্তির গলায় বলল, থাক থাক।

অরুণ একজনকে দেখিয়ে বলল, আমার মা!

তিলক যেন মুস্কিলে পড়ে গেলেন। তিলক ভেবে পেলেন না এক্ষেত্রে কী বলা উচিত।

অলক কুণ্ঠিত গলায় বলল, এ শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়া। কত ভাল ব্যবস্থা ছিল কানাইবাবুর বাড়ি। বাবার যে কী জেদ চাপল!...বয়েস হয়ে এতো রাগী হয়ে গেছেন। বোঝানো যায় না। আর এক জেদ ভাত খাওয়াতে হবে। কী বলব বলুন। তিলক ওর কুণ্ঠা দেখে নিজেই ভিতরে ভিতরে আরো কুণ্ঠিত হলেন। তাঁর থেকে বছর পাঁচছয়ের ছোট আবালবৃদ্ধ ভাইটার দিকে তাকালেন। দেখে মনে হচ্ছে-বুঝি তিলকের থেকে পাঁচ দশ বছরেরই বড়।

'কান' যদি উইপোকা তো দারিদ্র হচ্ছে ইঁদুর। একজন ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে কাটে; অপর জন তাড়াতাড়ি কেটে কুটপাট করে দেয়।

তিলকের কুণ্ঠিত হয়ে পড়া মনটা অদ্ভুত একটা আর্দ্রতায় ভরে গেল অথচ 'সেণ্টিমেণ্ট' শব্দটাই তার দুচক্ষের বিষ।

একটু হেসে বললেন, কষ্ট হবে ভাবছিস কেন? একদিন তো এই দালানে এইখানে বসেই খেয়ে বড় হয়েছি। মনে পড়ে, 'আমি বড়দার পাশে বসব বলে দুই ভাইয়ের জেদ। পুলকের জেদ আমি বব্দাল কাতে বতবো।'

আশ্চর্য! এও যে একটা সস্তা নাটকের সংলাপের মত লাগছে!

তিলক তালুকদারের ভিতর থেকে এই কথাগুলো উঠে এল কী করে? কোথায় ছিল!

পুলকের বৌ একটা বাটিতে গরম দুধ এনে বসিয়ে দিল পাতের কাছে।

শিউরে উঠলেন তিলক। সর্বনাশ! দুধ! ও জিনিস আমি একদম খাইনা।

ছোট ভাইয়ের বৌকে কী বলে সম্বোধন করা সঙ্গত ঠিক ভেবে পেলেন না তিলক।

পুলক তাড়াতাড়ি বলল, বাড়ির গোরুর দুধ। গননপুরে তো আর দুধ দৈ চোখে দেখবার জো নেই। সব দুধ গোয়ালারা ছানা কাটিয়ে নিয়ে ভোরের বাসে চলে যায়। তবে বাবার জেদে দুটো গোরু রাখা হয়েছে—

সে গোরুর দুধ যে বাবা ব্যতীত আর কেউই খেতে পায় না, 'জোগান' ধরানো আছে—সে কথাটা কেউ ফাঁস করে দিল না এই রক্ষে।

তিলক বললেন, তা হোক, ও আমি একেবারে খেতে পারি না।

কী খেতে পারল না পারল কে জানে, শুধু বার বার এই নম্র নতমুখী বৌ দুটির দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, হয়তো একটু আয়োজন করতেই এদের সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। হয়তো ওই রুক্ষ বদমেজাজি বৃদ্ধের কাছে গালমন্দ খেতে হয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝে একথা বলতে গেলেন না, তোমরা খাবে না।

নাঃ। না বলাই ভাল। অতিথির জন্যে আয়োজিত তিন চারটি বাটি সাজানো পাতের পাশে ওদেরকে খেতে বসতে বলা লজ্জাতেই ফেলা। যদিও সেই তিন চারটি বাটির মধ্যে যে কী আছে, তা' দেখবার চেষ্টা করলেন না।

ভাতের পাহাড় দেখে চমকে উঠে তিন ভাগ তুলে নিতে বলেছিলেন, তুলল না। বলল, থাক না, যা পারেন খান। পাতে খাবার লোক আছে।

ছি ছি। পাতের খাওয়া আবার কি কথা।

তিলক ভীষণভাবে আপত্তি করে উঠেছিলেন, ওরা জানালো তিলকের পাতে খেতে পাওয়া বাড়ির ছেলেপুলের পক্ষে ভাগ্যের কথা। যদি ওনার মত হতে পারে।

শুনে বড় পীড়িতবোধ করছিলেন তিলক।

চুপ করে একটু খাবার চেষ্টা করে মুখ তুলে অন্য প্রসঙ্গে এলেন। জিজ্ঞাসার গলায় বললেন, 'নতুন জ্যেঠিমা ?'

'নতুন জ্যেঠিমা' অর্থে অলক পুলকের মা, তারক তালুকদারের দ্বিতীয় পক্ষ।

'পুরনো জ্যেঠিমাকে' কোনোদিনই তেমন মনে পড়ে না তিলকের, জ্যেঠিমা বলতে এই একজনই। তবু নতুন জ্যেঠিমাই বলতে শিখেছিল অন্য একজনের বলা শুনে। সেই 'আর একজন' সারাক্ষণ তিলকের ভিতরটা আলোড়িত করে চলেছে। ছায়া ফেলছে এখানে ওখানে। এক একসময় এই দালানে ওই জানলাটার নীচে ছোট্ট একটা কাঠের পীড়ি পেতে ভাত খেতে বসেছে।

আর কোথায় যেন একটা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠছে, মেয়েমানুষের এতো নবাবী। পীড়ি নইলে খেতে বসা হয় না। দেবো একদিন ওই পীড়িকে উনুনে গুঁজে। জ্বালানী বাঁচবে খানিক।

এ কণ্ঠের অধিকারিণী কে ?

সেই নতুন জ্যেঠিমা না ?

তবু তাঁকে পুজিয় করে দিদি বলতো 'নতুন জ্যেঠিমা।'

তিলকের দিদি উমা। তিলকের থেকে তিন বছরের বড়। তাই পুরনো জ্যেঠিমাকে তার মনে ছিল। বলতো, তিনি কী ভালই ছিলেন রে তিলু। ছোট্ট কালে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। আর এখন জ্যাঠামশাই কোথা থেকে যে এই এক বৌ আনলেন !

আচ্ছা এইসব কথাগুলো কি এই ভাঙা বাড়িটার দেওয়ালে দেওয়ালে অলক্ষ্যে কোথাও টেপ করা ছিল ?

দেখছিস তো তিলু ? নিজে যেন মেয়েমানুষ নয় ?···দেখছিস তো তিলু, বাড়িতে তিন চারটি গোরু, তোকে একটু দুধ দেয় না।

দুধ খেতে আমি চাইও না। বিচ্ছিরী লাগে।

বিচ্ছিরী তো লাগবেই। যদি কোনোদিন একটু দেয় তো জল মিশিয়ে। আমি সব দেখতে পাই রে তিলু।

সেই 'নতুন জ্যেঠি' বেঁচে বর্তে থাকলে, নিশ্চয়ই পরিস্থিতি এমন শান্তস্তব্ধ হতো না। অনুমান করেও তিলক প্রশ্নসূচক স্বরে বললেন, 'নতুন জ্যেঠি ?'

অলক বলল, মা তো অনেকদিন হলো মারা গেছেন। বারো মাস পেটের অসুখে ভুগতেন। সাবধানও হতে চাইতেন না।

অসমাপ্ত কথায় ফুলস্টপ দিয়ে দিল।

কিন্তু আরো একটা লোক ছিল না এ বাড়িতে ?

অলকরা যাকে বলতো মামা !

আর তিলকরা কিছুতেই মামা বলতে চাইত না।

উমা বলতো, 'মামা' বলবে না কচু বলবে ! দেখলে গা জ্বলে যায়।

জ্যেঠিও অবশ্য ঘাড় ধরে বলিয়ে ছাড়তো না। হয়তো অন্য অভিসন্ধি ছিল ভিতরে ভিতরে

আবার কোন একটা দেওয়াল থেকে একটা টেপ বেজে উঠল, কথা বলে উঠল, তিলু জ্যেঠামশাই তোকে তখন অমন মারছিল কেন রে ? মারেনি ? বললে শুনছি। গালে এখনো পাঁচ আঙুলের দাগ !

এই টেপগুলো কেন এমনভাবে তিলককে তাড়া করছে ?

বড়দা ! কানাইবাবুর লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। বলছে 'দেরী আছে কি না।'

অর্থাৎ তাগাদা দিতে এসেছে। এতো দেরী হচ্ছে কেন ? না বলে ঘুরিয়ে বলছে।

তিলক কি সারারাত ওই টেপগুলো শুনতে চান ? তাই অলসভাবে বললেন, বলে দায় গে এতো রাত্তিরে আর যেতে ইচ্ছে করছে না, এখানেই শুয়ে পড়ি।

এখানেই শুয়ে পড়ি !

আকাশ ভেঙে এসে মাথায় পড়ল যে।

অলক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে অসম্ভব বড়দা। এখানে এই গরমের মধ্যে বিছানা টিছানা ইয়ে নয়। না না সে আপনি পারবেন না। দারুণ কষ্ট হবে আপনার।

আরে এতো কী কষ্ট ! তবে তোমাদের যদি অসুবিধে হয়—

ইস এ কী বলছেন। আমাদের অসুবিধে কী ? আপনারই মানে—খাটফাট তো নেই, যতসব কেঠো চৌকী।

তিলকেরও যেন জেদ চেপে যায়।

আহা দেখলামই না হয় একদিন, 'কেঠো চৌকী' কী জিনিস।

তিলকের মুখে কৌতুকের হাসি।

অলক বলে ওঠে, কবে ছেলেবেলায় কীভাবে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তাই বলে কি এখন আর—

হঠাৎ অরুণ এসে দাঁড়ায়।

বলে, বাবা, মা বলছেন, জ্যাঠামশাই ছেলেবেলায় যে ঘরে শুতেন, সেই ঘরে বিছানা পেতে দিচ্ছেন মা। বললেন, 'নিজেরই তো বাড়ি, কষ্ট হবে তো হবে !'

কিন্তু হঠাৎ ওদিকের ঘরের মধ্যে থেকে এমন আর্তস্বর উঠল কেন ?

অলক ! পুলক ! কানাইবাবুর গাড়ি ফিরে গেল যে ! তিলু গেল না ?

পুলক দরজার কাছে গিয়ে বলল, না। বললেন, রাত হয়ে গেছে, এখানেই শুয়ে পড়বেন !

এখানেই শুয়ে পড়বে ?

তারক তালুকদারের ভাঙা-ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলাটা আরো অতি প্রশ্ন করে ওঠে, কেন ? কেন ? এখানেই শুয়ে পড়বে ? কেন ? তোরা বলতে পারলি না, 'এখানে তোমার কষ্ট হবে।'

বলা হয়েছিল তো। বললেন—

তারকের গলাটা আরো ফ্যাঁসফেঁসিয়ে ওঠে, এখানে তোদের ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। এখানে শোবার ইচ্ছে কেন ? পুলক, তুই বলগে যা—

কী অদ্ভুত, ভয়ার্ত স্বর।

সবই শুনতে পাচ্ছিলেন তিলক।

দরজার সামনে সরে একটু হেসে বললেন, আপনি এতো ভয় পাচ্ছেন কেন বলুন তো জ্যাঠামশাই ? ব্যাপার কী ?

তারক হালছাড়া গলায় বললেন, ভয় পাবো কেন! ভয় পাবো কেন ? তোমার কষ্ট হবে বলেই—

কষ্টের কী আছে ? আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন!

তিলকের মুখে যেন একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হাসি।

অরুণ! তোমার মা কী করে বুঝতে পারলেন আমি ছেলেবেলায় এই ঘরে শুতাম।

অরুণ খুব লজ্জিতভাবে বলল, মা বলেন দরজার পিঠে কাঠের গায়ে ছুরি দিয়ে আপনার নাম খোদাই করা আছে। তাই মনে করেছেন—

আছে! আছে সেই নাম খোদাইটা!

তার মানে একা তিলকেরই নয়, আরো একটা নামও খোদাই হয়ে আছে।

কিন্তু শুধুই কি দরজার কাঠে ? আরও একটা জায়গাতেও খোদাই হয়ে নেই কী ? শুধু সময়ের ধুলো পড়ে পড়ে—আজ হঠাৎ ধুলোটা সরে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

বড়দা এই হ্যারিকেনটা থাকলো। শোবার আগে কমিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।

কী সর্বনাশ! ঘরে কেরোসিন! না না। কোনো দরকার নেই। সঙ্গে টর্চ আছে। ও হো, আমার সঙ্গে যে একটা অ্যাটাচি ছিল—

অলক হাসল, ওই যে আপনার মাথার কাছে দেওয়াল আলমারির মধ্যে!

আপনি তো এসেই দালানের দেওয়ালের কাছে নামিয়েছিলেন। দামী জিনিস-টিনিস থাকতে পারে ভেবে আপনার বৌমা তুলে এনে—

বৌমা!

এতক্ষণে মনে পড়ল তিলকের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে 'বৌমা' বলা হয়।

হেসে বলে উঠলেন, বৌমারা তো বেশ হুঁশিয়ার।

ওরে বাস! হুঁশিয়ার না হলে রক্ষে আছে। না হলে বাবা আস্ত রাখবেন?

তিলকের হঠাৎ খুব আশ্চর্য লাগল।

একটা মানুষ সত্তর আশী বছর ধরে এইরকম একটা প্রবল প্রতাপ শাসন চালিয়ে আসছে! আর সংসার তাই মুখ বুজে সহ্য করে আসছে! কিসে হয় এটা? একপক্ষের দুর্দান্ত দুর্মুখতার জন্যে, না অপর পক্ষের আনুগত্যের শিক্ষায়?

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা এবার খাওয়া-দাওয়া কর গে। তা' তোমার একটি ছেলেকেই তো দেখলাম, আর সব?

আছে। দু ভাইয়ের মিলিয়ে আছে গণ্ডা দেড়েক। সন্ধ্যেবেলা ঘুমোতে যায়। কাল সকালে আপনাকে প্রণাম করবে।

তিলকের বুঝতে অসুবিধে হলনা। 'ঘুমতে যায়নি' ঘুমতে যাওয়ানো হয়েছে। যেমন হতো একদা তিলককেও বাড়িতে কোনো অতিথি এলে, আর তারজন্যে একটু বিশেষ রান্না-বান্নার ব্যবস্থা হলে, তিলককে আর উমাকে সাত-সকালে পান্তা ভাত কি সেদ্ধভাত খাইয়ে পড়শীর বাড়ি চালান করা হতো। রাত হলে, সন্ধ্যার মধ্যেই ঘরের মধ্যে বিছানায়।

তিলক আবার আশ্চর্য হলেন। এইসব কথাগুলো মনের মধ্যে এতো স্পষ্ট হয়ে রয়ে গেছে দেখে। কোথায় ছিল?

তিলক সেই অদেখা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কেমন যেন একাত্মতা অনুভব করলেন। কিন্তু এদের মা-বাবা রয়েছে। বাড়ির বজ্র শাসনের ধারা কি এইভাবে তিন পুরুষ ধরে চলতে পারে? 'জেনারেশন' গ্যাপ কথাটার তাহলে অর্থ কী? নাকি ওটা শুধু শহরের কথা? কিন্তু—গ্রামে গঞ্জে শহরে হাওয়া তো এসে গেছে অনেক।

ঘরটার চেহারায় সেই চল্লিশ বছর আগের ছাপ দেখতে পেলেন। মনে

হলো দারিদ্র্য একটা ভারী পাথরের প্রাচীর। তাকে ভেদ করে সহজে কোনো হাওয়া এসে ঢুকে পড়তে পারে না।

এই অলক পুলক, কী করে কে জানে। লেখাপড়া বিশেষ শিখেছে বলে মনে হচ্ছে না। কী হতশ্রী চেহারা!

এদের জন্যে এমন মমতা অনুভব করছেন কেন তিলক? এরা তো ওই জ্যাঠামশাই, আর সেই নতুন জ্যেঠির অবদান!

আশ্চর্য, এরা এমন নিরীহ হল কী করে? নাকি এটা ছদ্মরূপ?

তা, মনে হচ্ছে না। একটা ওদের থেকে 'বড়' হয়ে যাওয়া মানুষকে নিজজন ভাবতে পেরে যে কৃতার্থমন্যের ভাব ফুটে উঠেছে ওদের মুখে। সেটা কী মেকআপ হতে পারে?

হঠাৎ অলক বলে ওঠে। এই দেখুন বড়দা, আপনার ভাইপোর কাণ্ড! পাখা হাতে নিয়ে এসে হাজির! যতক্ষণ না আপনার ঘুম আসবে, বাতাস করবে।

তিলক কপালে হাত দিয়ে বলে ওঠেন। সর্বনাশ! তাহলে তো সারা-রাতেও ঘুম আসবে না আমার! আরেবাস, এ কী ছেলে জন্মেছে রে! এত জীবে দয়া! ভবিষ্যতে মহামানব হবে। না বাবা কেউ বাতাস টাতাস করলে আমার ঘুম আসা অসম্ভব। বরং রেখে যাও এখানে।

অরুণ মুখ বাড়িয়ে বলল। আমার কোন কষ্ট হতো না জ্যাঠামশাই।

আরে তোমার কষ্টর জন্যে ভাবছিনা। কষ্ট আমারই হবে! যাও যাও পালাও।

আচ্ছা আপনি তাহলে টর্চটা বার করে কাছে রেখে শুয়ে পড়ুন!

তিলক ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করে একবার টিপে দেখেন। ফস করে ঘরের মধ্যে তীব্র আলোর ঝলকানি খেলে যায়। আর একটুকরো অস্ফুট মন্তব্য কানে আসে তিলকের 'ইস! কী জোর আলো!'

মুগ্ধ বালক-কণ্ঠের এই উক্তিটি তিলককে আর একবার আন্দোলিত করে।

ছেলেটার বয়েস কত হবে? বারো তেরো মত, তাইনা?

ওই বয়েসের একটা ছেলে জীবনে প্রথম টর্চ দেখে এমনি চমকে উঠেছিল।

কার দেখেছিল? পাড়ার একজনেদের নতুন জামাইয়ের হাতে। টর্চটা

একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেটার। লজ্জায় বলতে পারেনি।

এখন আর টর্চ জিনিসটা কোনোখানেই নতুন নয়। আদিবাসী উপজাতি, সুন্দরবনের বুনোরা, এদের হাতেও টর্চ দেখেছেন তিলক। এখানেও অবশ্যই টর্চটা ছাতা জুতোর থেকেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবু গরীব অথবা কৃপণ ঘরের ছেলেরা চির বঞ্চিতই!

আচ্ছা বড়দা। আপনি তাহলে শুয়ে পড়ুন। অরুণ আয়।

বলে, হ্যারিকেনটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অলক। দরজার কপাটটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে।

মুহূর্তে গভীর অন্ধকারে ডুবে যায় ঘরটা।

একটুক্ষণ? স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন তিলক তালুকদার। এক্ষুনি মশারির মধ্যে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে না।

মশারিটা এতো নীচু যে বসলে মাথায় ঠেকবে।

তিলক তাকিয়ে দেখে একটু হাসলেন।

তিলক ঠিক অনুভব করতে পারলেন না। দুটি বৌয়ের কতোটি চেষ্টায় একটা মশারি ফেলা ফর্সা বিছানা বানিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তারপরেই মনে পড়ল, আচ্ছা এ ঘরে কি কখনো তিলক নামের ছেলেটা মশারি ফেলা বিছানায় শুয়েছে? তার সঙ্গে বিছানার আর একপ্রান্তের অধিকারিণী উমা নামের মেয়েটা?

উমা বলতো, এই ছেঁড়া খোঁড়া ধুতিটা নিয়ে মুখ মাথা ভাল করে ঢেকে শো তিলু। মশায় আর রাখবেনা। টেনে নিয়ে গিয়ে ওই আমবাগানে ফেলে দেবে।

বলতো আর হি হি করে হাসতো।

শত দুঃখেও হাসির বিরাম ছিল না উমার। তবে শুধু 'তিলুর' কাছে।

কিন্তু এখন কি তাকে দিদি বলে মনে হচ্ছে? না একটা ছোট্ট মেয়ে মাত্র!

ব্যাগ থেকে রাতে পরবার জামা পায়জামা বার করে পোষাকটা বদলে ফেললেন তিলক। দেয়াল আলমারীটার মধ্যেই ব্যাগের ওপর ছাড়া ধুতি পাঞ্জাবীই রাখলেন। হ্যাঁ গ্রামে ট্রামে আসতে ধুতি পাঞ্জাবীই মানায় ভাল। খদ্দরটদ্দর নয় অবশ্য। ধুতি কাঁচির, পাঞ্জাবী কটনের।

কাঁচবিহীন পাল্লাবিহীন এই খিলেনটাকেই 'দেওয়াল আলমারি' বলা হতো। এখনো তাই বলা হচ্ছে। এর মধ্যেই না তিলক নামের ছেলেটার ইস্কুলের বই খাতা থাকতো? ইস্কুলের বই। মানে মাষ্টারের পায়ে ধরে ফ্রী করে দেওয়া ইস্কুল। আর অন্য বাড়ির ছেলেদের কাছ থেকে চেয়ে আনা তাদের কিছু বাতিল বই।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই তিলক টর্চটা জেলে দরজার পিঠটা দেখতে সরে এলেন।

হ্যাঁ দেখতে পেলেন আলকাতরা লাগানো দরজার গায়ে রীতিমত গভীর করে খোদাই করা দুটি নাম। 'তিলক' 'উমা।'

টর্চ নিভিয়ে ফেলে একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিলক। তাহলে কী জানলার ওপর উঠে, উঁচু সাঙার ওপর হাত দিলেই হাতে পেয়ে যাবেন একটা মজবুত করে গড়া গুলতি! একটা কঞ্চি দিয়ে বানানো লাটাই, আর একটা আলুঘষা লাট্টু। শৈশবের একমাত্র পরম ঐশ্বর্য!

ওই খোদাই করা নাম দুটোয় হাত ঠেকিয়ে ভাবতে লাগলেন তিলক। আমি কেন, এখানে আসতে রাজী হলাম তখন? আমি তো বলতে পারতাম। টাইম হবে না।

গগনপুরের সফরের নামে মনের মধ্যেটা একটা নাড়া দিয়েছিল বটে! গগনপুরের মাঠ-ঘাট, পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন হয়েছে এখন ভাবতে মনের মধ্যে একটা সিরসিরিনি এসেছিল, আর গগনপুরের রাতের আকাশটা একবার দেখবার সাধ হয়েছিল বলে, এক রাত্তির থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, এসবই ঠিক। গগনপুরের কোনো মধুরস্মৃতির জন্যে নয়। যেখানের মাঠ-ঘাটে তিলক তালুকদারের মৃত শৈশবকালের শবদেহটা শোওয়ানো আছে, সেখানটা একবার দেখবেন, দেখাবেন সেই শবদেহকে, এই ইচ্ছায় উদ্বেল হয়েছিলেন।

তাই বলে একথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, তারক তালুকদারের বাড়ির খাপরি ওঠা দালানে ভাত খেতে বসবেন? আর ছোট্ট এই ঘরটার মধ্যে, ছোট্ট অপরিসর কাঠের গরাদে দেওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে গগনপুরের রাতের আকাশটা দেখতে বসবেন?

কী অপরিবর্তিত এই পরিবেশ। এখনো জানলার বাইরের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় উঠলে, কি

জোর বাতাস বইলে ওরা ওই ঝাঁকড়া মাথাগুলো দোলাতে শুরু করবে।

এই দোলাটা শুরু হলেই একটা বালিকাকণ্ঠ ভীতত্রস্ত একটা শিশুকে বলে উঠতো, চোখবোজ, চোখবোজ ভূতেরা মাথা দোলাচ্ছে।

জানলাটা বন্ধ করে দে না রে দিদি।

বাবা রে! ওর কাছে কে যাবে?

না, এখন বাতাস বন্ধ।

ভূতেরা মাথা নাড়া দিচ্ছে না।

কিন্তু কোথায় কোনখানে যেন একটা চাপা প্রেত-কণ্ঠের হিসহিস শব্দ শোনা গেল ঃ

হ্যাঁ, আমি দেখেছি ফস করে একবার আলো জ্বলে উঠতে। কেন? কী মতলবে রাতে থাকার জেদ?···আমি ভালবোধ করছি না। আজ তোমরা কেউ আমার ঘরে থেকো!···আঃ! বুঝতে পারছ না, কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ অত আরাম ছেড়ে এই অসুবিধের মধ্যে—

আরো চাপা একটা স্বর; আপনিই আহ্লাদ করে ডেকে এনেছিলেন। উনি নিজে থেকে আসেননি!

আমি এনেছিলাম, যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ির অংশটা তোমার নামে লিখিয়ে নিতে পারি। রাতে থাকার কথা বলিনি।

একটু স্তব্ধতা!

তারপর আবার স্বরক্ষেপ, বাইরে থেকে দরজার কড়ায় একটা দড়িফড়ি বেঁধে দিয়ে এসোনা! যাতে চট করে বেরিয়ে পড়তে না পারে।

আঃ! কী বলছেন কী? রাতে বেরোবার দরকার হলে?

আহা সে না হয় পরে বলা যাবে বাড়ির বাচ্চা ছেলেপুলে মজা করতে বেঁধে রেখেছে।

বাবা! পাগলামীর একটা মাত্রা থাকে!

বেশ তবে তোমরা আমার ঘরে থাকো! ও যদি হঠাৎ এসে আমার গলাটা—

তারক তালুকদার নামের লোকটা কি অনুমান করতে পারছে, ওর ওই চাপা হিস হিস শব্দের কথাগুলো দেয়াল ভেদ করে এঘরে এসে পেঁছিচ্ছে? অনুমান করতে পারেনি তিলক দরজার পিঠে তার নাম খোদাই দেখতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজাটা এখনো বাইরে থেকে বাঁধা হয়নি।

তিলক ইচ্ছে করলেই ফট করে কপাট হাট করে বেরিয়ে গিয়ে ওই প্রাণভয়ে ভীত, ক্রন্দনাক্ত বৃদ্ধের গলাটা চেপে ধরে বলে উঠতে পারেন, 'দিদি কোথায়? অ্যাঁ। দিদি কোথায়?' বলুন! বলুন! সেই আমার বেচারী দিদিটা!

কিন্তু তাই কি সম্ভব?

নাঃ, মশারির মধ্যে ঢোকাও সম্ভব হচ্ছে না।

জানলা দিয়ে ঝপাঝপ মশা আসছে, তবু ওই জানলার কাঠের গরাদের কপাট চেপে দাঁড়িয়ে তিলক ভাবতে চেষ্টা করেন, দিদি কোনখান দিয়ে চলে গিয়েছিল।...

ওই আমবাগানের মধ্যে দিয়েই না?

ভয়ংকর একটা দুর্যোগ নামবার তালে আকাশটা অনেকক্ষণ তোড়জোড় করছিল। দুপুরটাকেই মনে হচ্ছিল আসন্ন সন্ধ্যা।

কালো পাথরের মত মেঘের চাঁইয়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ হঠাৎ একটা আগুনের ফিতে তীব্র বেগে দুলে উঠছিল। আর পরক্ষণেই গগনবিদারী একটা শব্দ গগনপুরের হৃৎপিণ্ডকে চমকে চমকে দিচ্ছিল।

তা' এমন তো হয়েই থাকে।

কিন্তু এরকম ভয়ংকর ভয়ংকর সময়ে তো তিলু নামের ছেলেটা তার দিদির কাছ ছাড়া হয় না। দিদি কাজ করে আর সে তার পায়ে পায়ে ঘোরে।

অনেক বড় দিদি নয়, মাত্র তো তিন বছরের তফাৎ। পিঠোপিঠি ভাইবোনের ঝগড়া ভালবাসায় যা মধুর হবার কথা কিন্তু মাতৃহীন এই দুই ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল যেন 'আশ্রয়' আর আশ্রিতের। 'দিদি' তিলুর পরম আশ্রয়। আর দিদির মধ্যে অগাধ মাতৃস্নেহ।

নতুন জ্যেঠি কি তার সেই বিচ্ছিরী ভাইটা কেবলই বলতো, 'বুড়ো খোকা লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে কেবলই দিদির আঁচল তলায়। দেখে হাড় জ্বলে যায়।

কিন্তু তিলু তাতে গুটিয়ে গিয়ে আরো বেশী দিদির আঁচল ধরা হতো। হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দ শুনলে যেখানেই থাকুক, দিদির কাছে ছুটে চলে আসতো।

কিন্তু সেদিন?

না সেদিন তা' করেনি।

সেদিন কেন, তার আরো কতদিন যেন আগে থেকে তিলু দিদির সঙ্গ ছাড়া।

তিলুকে কড়া নিষেধ করা হয়েছিল দিদির ধারে কাছে না যেতে। দিদি'কে না ছুঁতে। দিদিকে শুতে দেওয়া হতো উঠোনে মানকচুর পাতা পেতে। খেয়ে দিদি সেই পাতা ফেলতে যেত অনেকটা হেঁটে 'পেঁকো ডোবায়।'

কেন? কেন আবার!

তিলুর দিদির যে কুষ্ঠ হয়েছে। ওকে একদিন 'গৌরীপুর' না কোথায় যেন কুষ্ঠ আশ্রমে রেখে আসা হবে।

কুষ্ঠ!

শুনে পর্যন্ত তিলু এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আর দিদির দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারত না।

পাড়ার কোনো গিন্নীরা আর এ বাড়িতে বেড়াতে আসতো না; যেটা আগে ছিল নিত্য দিনের ঘটনা।

তিলু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো, আর ভাবতো দিদি 'গৌরীপুর' না সেই কোথায় চলে গেলে, তিলু কোথায় থাকবে? কার কাছে?

সেদিন সেই আসন্ন দুর্যোগে তিলু যখন অসহায় চোখে আকাশে আগুনের ফিতের চমক দেখছিল, তখন হঠাৎ বাজের আওয়াজ ছাপিয়ে মানুষের গলার বজ্র গর্জন শোনা গেল, বেরিয়ে যা; এক্ষুণি যা!

এ গলা তারক তালুকদারের। কাকে বলছেন?

তিলু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে চলে এসে দেখতে পেল তারক একখানা উনুনে জ্বাল ঠেলবার চ্যালা কাঠ নিয়ে ধাঁই ধাঁই পিটোচ্ছেন উমা নামের বেতডগার মত মেয়েকে।

তার সঙ্গে নতুন জ্যেঠির তীক্ষ্ম কণ্ঠও তীব্র হয়ে উঠেছে, খাবার জলের কলসী থেকে জল ঢেলে খাওয়া! অ্যাঁ। বাড়ি সুদ্ধ সকলের ওই পাপ রোগ হোক তাই চাস, কেমন?

হঠাৎ চির-নম্র চির-নীরব মেয়েটা প্রহারের যন্ত্রণায় চীৎকার করে বলে উঠেছিল, কখনো আমার ওই রোগ হয়নি। তোমরা মিছিমিছি করে বানিয়ে বানিয়ে—

কী? কী বললি? আমরা বানিয়ে বানিয়ে বলছি? লক্ষ্মীছাড়ি

হারামজাদী এক্ষুনি বিদেয় হয়ে যা ! বলি গননপুরে এতো পুকুর, ডুবে মরতে পারছিস না ? এখনো ওই কুঠে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না। আজ তোকে বিদেয় করে আর কাজ ! বেরো বেরো বলছি।

হঠাৎ আর একটা বাজের শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এই আসন্ন দুর্যোগটাকে কাজে লাগাবে বলেই কি এই আয়োজন ছিল সেদিন ? যাতে পাড়ার লোক টের না পায়।

না টের পাবার কথা নয়।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এসেছে তখন।

কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখবে, একটা হতভাগা কিশোরী মেয়ে প্রহার তাড়িত পশুর মত ছুটতে শুরু করেছে !

আর তিলু ?

তিলু যখন দেখতে পেল তার জীবনের একমাত্র আশ্রয় দিদি ছুটে চলে যাচ্ছে, বৃষ্টির ঝাপটে হারিয়ে যাচ্ছে—সে কি তখন খেয়ালে রাখবে দিদিকে ছুঁতে নেই। দিদির কুষ্ঠ !

সেও ছুটবে না সেই ঝড়জল ভেদ করে ? ছুটে গিয়ে ধরে ফেলবে না, দিদি যাসনে, দিদি তোর পায়ে পড়ি মরিসনি।

আম বাগানের ঘন ছায়ায় নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছিল উমা।

আস্তে ভাইয়ের জড়িয়ে ধরা হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, বাড়ি যা তিলু। আমি মরবো না। কিছুতেই মরবো না। ওরা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে কুষ্ঠ হয়েছে। আমি বেঁচে থেকে প্রমাণ করব ওদের কথা মিথ্যে। আমি যাতে মরি, তাই এই কথা রটিয়ে—

তিলু মুখের ওপর গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির ধারা হাত দিয়ে চেঁচে ফেলতে ফেলতে অবাক হয়ে বলেছিল, তুই যাতে মরিস ! কেন দিদি ! তুই এতো কাজ করতিস !

দিদি হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে বলেছিল, সে তুই বুঝবি না তিলু। নতুন জ্যেঠির ভাই আমায় খারাপ করে দিয়েছে। আমি—আমি আমার—তিলু তুই বাড়ি যা !

খারাপ করে দিয়েছে !

কিন্তু তিলুর মাথার মধ্যেও যে তখন আকাশের গায়ের মত একটা আগুনের ফিতে ঝলসে উঠেছে।

তবু তিলুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, খারাপ করে দিয়েছে। মানে ?

মানে তুই বুঝবি না তিলু। বাড়ি যা! ওকি ? কোনদিকে যাচ্ছিস ? ও তিলু—

কিন্তু তিলু আর শুনতে পাচ্ছে না! তিলু এখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে।

পিছন থেকে যে ব্যাকুল একটা ডাক ঝড়বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে তার পিছু পিছু ছুটে আসছে, তিলু! তিলু! ফিরে আয় ভাই! গাছ চাপা পড়ে মারা যাবি রে। তি—লুউ!

তিলু ফেরেনি।

গাছ চাপা পড়ে মারাও যায়নি।

তিলু এই বিশাল সংসারে হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দিদি ? তিলু জানে না ওই গাছ চাপা পড়ে মারা যাওয়াটা তিলুর দিদিরই ঘটেছিল কিনা। সেই পাতলা রোগা বছর পনেরোর মেয়েটা জোর গলায় বলেছিল বটে 'আমি মরবো না। কিছুতেই মরবো না।'

কিন্তু তার সেই ঘোষণা কি হাস্যকর মাত্র হয়নি ? এই হিংস্র সংসারে, যেখানে একটা অসহায় মেয়েকে একা পেলে অসংখ্য হিংস্র প্রাণী তাকে 'খারাপ' করে দেবার জন্যে ওং পেতে বসে থাকে, সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে ?

না মরা, আর বেঁচে থাকাটা তো এক নয়!

তবে তখনকার সেই জলঝড় মাথায় করে ছুটে চলে যাওয়া তিলু কি এতো কথা ভাবতে পেরেছিল ? তার মাথার মধ্যে কে যেন একটা চাবুক চালাচ্ছিল, 'আমায় খারাপ করে দিয়েছে! আমায়—আমায়—।'

এই খারাপ করে দেওয়া অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর কিছু একটা দিদিকে নিয়ে কী করবে তিলু ?

পক্ষটা বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ চলছে।

শেষ রাত্রে আবছা একটু চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকেছিল ঘরের সেই ছোট জানলাটা দিয়ে। ঈষৎ স্নিগ্ধ একটু হাওয়াও। অথচ সকালে উঠে তিলক তালুকদারের মনে হচ্ছিল সারারাত ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপি গেছে।

ঘর খুলে বেরিয়ে এলেন তিলক।

তারকের ঘঙ্‌ঘঙে কাশির আওয়াজ শুনতে পেলেন। এখন এই সকালের আলোয় রাত্রের সংকল্পটা কী হাস্যকরই লাগল। এখন তিলক ওই ঘরে গিয়ে, ওই 'খুনী' বুড়োটাকে-ধমক দিয়ে বলতে পারবেন, দিদি কোথায় ? আমার সেই ভালোমানুষ দিদিটা ? আপনিই তাকে খুন করেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই। তাকে মারতে মারতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন।

কী অবাস্তব চিন্তা !

অথচ রাত্রে এই কথাগুলো মুখস্থ করেছিলেন তিলক, সকালে বলবার জন্যে।

এখন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছেন তিলক, তুমিই বা খোঁজ করেছিলে কই বাপু ? এই দেশেই তো ছিলে তুমি এতকাল যাবৎ। তার মানে তুমি তাকে খরচের খাতাতেই লিখে রেখেছিলে। তোমার সেই পুরনো ঘরের জানলা দিয়ে গননপুরে আকাশ দেখতে, স্মৃতি এমন তীব্র হয়ে উঠল। তাই না ?

তিলু তো তখন ছোট্ট একটা ছেলে মাত্র ছিল।

একটা মেয়ে হারিয়ে গেলে, কে না তাকে খরচের খাতায় লিখে না ফেলে ! তার মা বাপই কি ফেলে না ? ছেলেটা হরিয়ে গেলে যেমন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে ! হয়তো অসবে। হয়তো হঠাৎ একদিন এসে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠবে, 'মা' !

মেয়েটা হারিয়ে গেলে সে প্রতীক্ষা থাকে ? যদি কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে আশঙ্কা। যদি কোনোদিন সেই হারানো মেয়ে এসে দাঁড়িয়ে ডেকে ওঠে, 'মা।'

ওরে বাবা ! কী ভয়াবহ সেই পরিস্থিতি !

আবার কাশি শোনা যাচ্ছে। এ কাশি ইচ্ছাকৃত। যেন জানান দেওয়া 'আমি আছি।'

রাত্রির মোহ এখন অন্তর্হিত ? এখন সকালের আলোয় চারিদিক তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে গেলেন তিলক, এইখানে সারারাত ! ওইখানে বসে খেয়েও ছিলেন !

বড়দা ! একটু হাতমুখ ধুয়ে নিন। চা করছে আপনার বৌমারা।

এখানে হাতমুখ ধোওয়া। কোন জলে ? কোন বালতিতে ?

তিলক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না না, ওসব করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ওখানে একবার খবর দিতে পারলে হতো গাড়িটার জন্যে।

সে আর খবর দিতে হবে না।

হেসে উঠল পুলক, রাত শেষ হবার আগেই এসে বসে আছে।

আঃ। কী আরামের খবর!

বললেন, তাহলে বেরিয়েই পড়ি। ওখানে গিয়েই একেবারে—কই আর যাদের দেখবার কথা ছিল, তারা ?

পুলক হাসল।

সেই বালখিল্য বাহিনীরাও রাত ভোর না হতেই সেজেগুজে বসে আছে, আপনাকে দেখবে বলে।

গুটি চার-পাঁচ বিভিন্ন বয়েসের ছোটছেলেমেয়ে বোধকরি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাটামা পরেই প্রস্তুত ছিল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পুলক পরিচয় করে দিল, এইটি দাদার মেজছেলে অশোক, এইটি দাদার মেয়ে ছায়া। এইটি আমার বড় মেয়ে—

কিন্তু হিসেবগুলো কি মাথায় ঢুকছিল তিলকের ?

তিলক শুধু এদের মুখের দিকে আর চেহারার দিকে তাকিয়ে অতীতের একটা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছিলেন।

তিলক তাঁর ব্যাগ থেকে মুঠো করে একগোছা নোটবার করলেন। লাজুক গলায় বললেন, আমি তো এদের জন্য মিষ্টিটিষ্টি কিছুই আনতে পারিনি। এই ধর। মিষ্টি কিনে—

পুলক অবাক হয়ে বলল, এতো কী হবে ?

বাঃ, ওরা কি একা খাবে ? সবাই মিলে খাবি !

অলক এসে দাঁড়াল। বলল, না না বড়দা! এতো টাকা কেন ?

তিলক বললেন, পাকামি রাখতো। চিরকাল এই স্বভাব। আর শোন্, বৌমাদের ডাক একটু। আমি তোদের দাদা, [illegible] বিয়ের সময় তো কিছু আশীর্বাদী দেওয়ার সুযোগ পাইনি—

হ্যাঁ, দু চার হাজার টাকা সঙ্গে রাখা ছিল!

বড়দা!

অলকের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল

আপনি দেবতা।

এই ! আবার পাকা কথা। চুপচাপ থাক তো।

দুই বৌয়ের হাতে পাঁচশো করে টাকা দিলেন তিলক। আর হঠাৎ মনে হল, টাকা খরচ করে যে এরকম আনন্দের অনুভূতি আসতে পারে তা যেন কোনদিন উপলব্ধি করেন নি।

এদের ওপর মমতা এতো আসছে কেন ? জোর করেও তো মনে পড়ানো যাচ্ছে না, এরা তারক তালুকদারের বংশধর। যে তারক তালুকদার—

বৌ দুটি গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করল। আর ছোট বৌ হঠাৎ ঘোমটার বেড়া ভেঙে বলে উঠল, আবার আসবেন। আর তখন বড়দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন !

বড়দিকে ! ছেলেমেয়েদের !

চকিত হলেন তিলক। তারপর কথাটার মানে অনুধাবন করে হা হা করে হেসে উঠলেন। জোর গলার হাসি। পুলক, বৌমার যে দেখি আকাশ কুসুমের বায়না ! মাথা নেই তার মাথা ! হা হা হা।

সকালের আলো কী আশ্চর্য উজ্জ্বল। কী হালকা। এখন তিলককে দেখে কী মনে হচ্ছে সারারাত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কেটেছে তাঁর !

মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

পুলক বলল, সংসার করেন নি ?

কই আর ?

কেন ?

আরে দূর। সময় পেলাম কোথা ?

সত্যি, সময় পেলেন কোথা ? সেই বারো বছর বয়েস থেকে, এই বাহান্ন বছর বয়েস পর্যন্ত সময়ের স্রোতে উজান ঠেলে ঠেলে দাঁড় বেয়ে চলেছেন তিলক তালুকদার নামের লোকটা। কোন লক্ষ্যে ? তা জানেন না। তীরে উঠে কী করবেন জানেন না।

যারা উচ্চ আশার পিছনে ছুটতে থাকে, তারা কেউই কি জানে তীরটা কী ? তীরে উঠে কী করব ?

অরুণ এসে প্রণাম করল।

তিলক হেসে বললেন, একী তোমার হাতটা নিরস্ত্র কেন ? পাখা কোথায় গেল ? যা নিয়ে তেড়ে আসো।

অরুণ একটু কৃতার্থমন্যের হাসি হাসে।

এখন মনে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আর একটু বসলে হতো, আর দুটো কথা বললে হতো।

এর নামই কি পারিবারিক জীবনের স্বাদ? যে স্বাদটা তিলক কোনোদিন আস্বাদ করেন নি।

ওদিকে তিলকের গলার হা হা হাসি শুনে পর্যন্ত তারক ছেলে বৌয়ের প্রতি ঈর্ষিত হচ্ছেন। ভাঙা ভাঙা গলায় কেবলই হাঁক পাড়ছেন, অ অলক, অ পুলক, সব হাসি গপ্পোগুলো তোরাই করে নিচ্ছিস? এই বুড়োটার ঘরে একবার বোস এসে।

ওরা 'যাচ্ছি যাচ্ছি' করছিল।

হঠাৎ দেখা গেল লড়বড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বুড়ো দেয়াল ধরে ধরে।

একী বাবা! আপনি। কি আশ্চর্য!

তারক তালুকদার ধিক্কারের গলায় বলে ওঠে, তোমরা বুড়ো বলে হ্যানস্তা করতে পারো। আমার মনটা যা হচ্ছে। বলি এতো কিসের হাসাহাসি? অ্যাঁ?

ছেলেরা মুখ বেজার করে চুপ করে থাকল।

অরুণ এগিয়ে এসে বলল, এতো বুড়ো হয়েছো—তবু সব কথা শোনা চাই তোমার। কাকিমা বলছিল জ্যাঠামশাইকে, আবার যখন আসবেন জ্যাঠাইমাকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন, তো জ্যাঠামশাই বললেন, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! বিয়েই করেননি তো!

অ্যাঁ বিয়েই করেনি। বাবা তিলু, বিয়ে থা করনি? কেন?

ভারী উজ্জ্বল দেখায় তারকের মুখটা।

ওই হয়ে ওঠেনি আর কী!

বললেন তিলক।

হঠাৎ তারকের গাঢ় গভীর আবেগের স্বর থেকে উঠে এল কটি কথা, তাহলে আর কী বলব বাবা। তোমার যখন অভাব নেই, দরকারও নেই, তখন তোমার এই ভদ্রাসনের অংশটুকু তুমি তোমার ছোট ভাইদের নামে একটু দান করে দাও।

আঃ বাবা! আপনি কী পাগলামি চালিয়ে যাবেন? আশ্চর্য! চলুন বড়দা, ওরা হর্ণ দিচ্ছে।

সবাই প্রণাম করতে শুরু করল।

তিলকেরও একজন প্রণম্য আছে না ?

প্রণম্য ?

উপায় নেই ! মানুষের সমাজে বাস করার খেসারৎ !

নীচু হয়ে তারকের পা দুটো একবার ছুঁয়ে মাথা তুলে বলেন তিলক, এর আর দানপত্রের কী আছে ? আমার ওয়ারিশান তো এরাই ।

তারকের চুরাশী বছরের পুরনো মুখটায় আলো জ্বলে ওঠে। বলেন, সে তো বটেই ! সে তো বটেই। তো দেব, তোমার গোরুর গাড়ির চাকাকে আমরা সবাই ভোট দেব। তো জগতে এত ভালভাল জিনিস থাকতে, গোরুর-গাড়ির চাকাটা বেছে নিলে কেন বলতো বাবা ?

তিলক শান্ত গলায় বলেন, জগতের সব ভাল ভাল জিনিসে যে আমার অধিকার আছে, এটাতো কোনদিন অভ্যাস হয়নি জ্যাঠামশাই !

তারকের সেই আলো জ্বলা মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিগলিত একটি স্বর, তাতো ঠিকই ! তাতো ঠিকই ! তুমি ভিন্ন এমন মহৎ কথা কে বলতে পারবে ! তা হ্যাঁ বাবা—

দাঁত খোওয়ানো মুখে স্রেফ একটি শিশুর হাসি হেসে তারক তালুকদার বলে উঠল, ছেলেপুলেগুলোকে তো দেখলুম মিষ্টি খেতে দেদার টাকা দিলে, তো এই বুড়ো ছেলেটা বঞ্চিত হল কেন ?

উঃ।

মরমে মরে যাওয়া গলায় অলক বলে উঠল, বাবা, আপনি কি চান আমরা আর আপনার সঙ্গে না থাকি ? এইভাবে আমাদের মুখে চুনকালি দিলে—

আহা ঠিক আছে। ঠিক আছে।

তিলক বললেন, সত্যিই তো আমার তো এসেই একটা প্রণামী দেওয়া উচিত ছিল।

উচিত ছিল ? উচিত ছিলই বোধ হয়। তিলকের আজকের এই জীবন তো ওই তারক তালুকদারেরই দান। তা' না হলে, এই অলক পুলকের মতই এই ভাঙা বাড়ির একটু অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে অকাল বৃদ্ধ তিলক তালুকদারও তালুকদার বংশের প্রজাবৃদ্ধি করে চলতো, আর ওই শ্যাওলা ধরা উঠোনে পা হড়কে হড়কে জীবনের দিনের ঋণ শোধ করে চলতো।

আবার ব্যাগের মুখ খুললেন, তা থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, 'চলি' বলে উঁচু দাওয়া থেকে নামবার

ভাঙাচোরা সিঁড়ি গুলো আস্তে নামতে নামতে বললেন, এখানটা বড় রিস্ক হয়ে রয়েছেরে অলক, একটু মেরামত করা খুব দরকার।

অলক পুলক দুজনে দুদিক থেকে ধরবার মত ভঙ্গীতে আলগোছে নামছিল। বলল, দরকার তা বুঝি তো—

তা সত্যি। ছাঁপোষা সংসারী পেরে উঠিস না। কলকাতায় ফিরে আমি কিছু পাঠিয়ে দেব বুঝলি। মিস্ত্রী লাগাস একবার।

কলকাতায় ফিরে এই মুহূর্ত কি আবার ধরা দেবে ?

এই অতি দুঃখময় হলেও, শৈশব বাল্যের স্মৃতিমণ্ডিত পরিবেশ, আর সেই শৈশব বাল্যের প্রতিমূর্তি বহনকারী দৈন্য পীড়িত ছেলে ওই গুলো আর এই দুটো জীবনে ব্যর্থ অকাল বৃদ্ধ মানুষের নির্লোভ মর্যাদাময় অন্তরের পরিচয়, সব মিলিয়ে, যে প্রতিশ্রুতিটি উচ্চারণ করাল তিলককে সেই মুহূর্তটি ?

কে জানে হয়তো কাজের উত্তাল ঝড়ে ভুলিয়ে দেবে এ প্রতিশ্রুতি। তবু এই মুহূর্তটি মিথ্যা নয়।

তারকের মুখটা আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উঁচু দাওয়া থেকে ঝুঁকে বললেন, তা দিও বাবা। দিও। তোমারও তো পিতৃপিতমোর ভিটে! তো ভিটেকে আর ভুলে থেকো না বাবা। আবার এসো।

পুলক চাপা রুদ্ধ গলায় স্বগতোক্তি করে ওঠে, 'তুমি থাকতে নয়।'

তিলক আস্তে একটা হাত তার কাঁধে রাখেন। তিলকের মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষই কতো অসহায়! ওই নির্লজ্জ লোভী বৃদ্ধ! সে-ও তো তার লোভের কাছে অসহায়! সেই অসহায়তাই তাকে ওই ভাঙা সিঁড়ির ধাপে বসিয়ে দেয়। সিঁড়িতে বসে বসে, একধাপ একধাপ করে নেমে এসে তারক বলে ওঠে, দেব বাবা। তোমার গোরুর গাড়ির চাকায় আমরা সবাই ভোট দেব। তবে জগতে এতো ভাল ভাল বস্তু থাকতে গোরুর গাড়ির চাকা বেছে নিলে কেন বাবা তিলু ?

তিলক মাটিতে নেমে এসেছেন।

মুখটা তুলে হাসলেন। বললেন, জগতের কোনো 'ভাল'য় যে আমার অধিকার আছে, এ অভ্যাস হয়নি বলেই হয়তো!

বাইরের উঠোনটা ঘাসে জঙ্গলে আর ভাঙা ইঁটপাটকেলে আকীর্ণ, কোনো

মতে পার হওয়া। অথচ এই 'কোনোমতেই' চালিয়ে আসছে এরা। শুধু এরাই নয়, গ্রামে গঞ্জে পড়ে থাকা অলক পুলকের দল। পায়ের কাছ থেকে একটুকরো ভাঙা ইঁট সরিয়েও চলার পথ পরিস্কার করে নেয় না।

ইচ্ছে করলে বাড়ির এই সামনেটাকে সাফ করে দুটো জবা টগর গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়ে মনোরম করে রাখতে পারতো, বিনা পয়সায়, সামান্য খাটুনিতে। চেষ্টা করলে, বাড়ির আশেপাশে পিছনে ছড়ানো ছিটানো যে জমিটুকু রয়েছে, তাতে রান্না ঘরের প্রযোজনীয় শাকপাতা লাগাতে পারতো, খিড়কির পুকুরটাকে কেবলমাত্র বাসনমাজা কাপড়কাচার পুকুরে ফেলে না রেখে কিছু কুচোকাচা মাছও পালন করতে পারতো, কিন্তু করবে না। কিছু করবে না। শুধু দৈন্যদশার কাঁথাখানাকে গায়ে জড়িয়ে ভাগ্যকে অভিশাপ দেবে। আর শহর থেকে উড়ে আসা ধুলোর তিলক ললাটে মেরে গলায় ট্রান্সজিস্টার ঝোলাবে, 'শার্ট পেণ্টুল' পরবে, গলায় রুমাল বেঁধে হিন্দি সিনেমার গান গাইতে গাইতে সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াবে। বহু অনগ্রসর তার মধ্যেও কাছাকাছি কোথাও না কোথাও এক একটা সিনেমা হল গজিয়ে উঠবেই এসব অঞ্চলে, যাদের প্রধান উপজীব্যই হচ্ছে, 'মারদাঙ্গা' হিন্দী ছবি।

ভিতরে বাইরে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এই গ্রামদের বাঁচাতে পারে এমন শক্তি কি রয়েছে তিলক তালুকদারদের ?

জীপের মধ্যে কেশব আর কানাই পালের ছেলে বসে বসে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে যা আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিল, তার সারমর্ম হচ্ছে, কর্তার এই 'নাড়ীতো জোড়াভাবটা' আশ্চর্যজনক। কবে কোনকালে এই ভাঙা পচা বাড়িটায় জন্মেছিলেন বলে, হঠাৎ এখানে খেতে আসা, থেকে যাওয়া, এহেন ভাবপ্রবণতা তো ওনার মধ্যে কখনো দেখা যায় না। তা ওরতো মা বাপ ভাই বোন কেউ নেই শোনা গেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলে। তো বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মানুষ কেন ? কোনো কারণে অতিষ্ঠ হয়েই তো ?

অথচ দেখো! রাত্রে গাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হলো, আবার এখন এই দেরী! ওখানে ব্রেকফাষ্ট রেডি, আর এখানে হয়তো—

কথায় কথায় কর্তার স্বভাবের কী কী দোষ, এবং তার জন্যে কেশবদের কতটা অসুবিধে হয় এই বুঝিয়ে চলেছিল কেশব, এবং বারে বারেই সাবধান করে দিচ্ছিল, দেখবেন ভাই, কথাটা যেন চাউর না হয়।

কথাটা অবশ্য কিছুই নয় তেমন, নারীঘটিত কোনো দুর্বলতা আছে

তিলকের একথা পরম শত্রুতেও বলতে পারবে না। যেটা ভোট ভাষণে বিরোধীপক্ষের কিছুটা কাজে লাগতে পারতো। দোষ হচ্ছে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার ব্যাপারে কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই কর্তার। কখনো অতি তুচ্ছ একটা লোকের সঙ্গে ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন, কখনো একটা কেষ্ট বিষ্টু লোককে 'সময় নেই দেখা হবে না' বলে ভাগিয়ে দিলেন। এই কেশব টেশবদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কখনো ওদের একদম নস্যাৎ করে দেন।

ব্যাচিলার লোকেদের ওরকম খামখেয়ালীপনা থাকেই একটু।

এই দেখুন না, ক্লাবের ছেলেগুলোর কাছে প্রমিস করে বসলেন, 'তেমন দিন' এলে সবাইকে চাররী দেবেন। অথচ আবাব সবসময় চাকরী ফাকরীর বিরুদ্ধে। রেগে রেগে বলেন, দেশে এতো বেকার এর কারণ সবাই অফিসের চেয়ারে বসা চাকরী চায়। উপার্জ্জনের কতো অসংখ্য পথ আছে!

আরে মশাই বুঝছেন না, এনাদের প্রধান ধর্মই তো সুবিধাবাদ। যখন যেখানে যেটি বললে সুবিধে, তখন সেখানে সেইটিই বলেন। এই তো দেখলেন কালকের মীটিঙে—

থেমে গেল আলোচকরা।

এই মহতী আলোচনার মাঝখানে দেখা গেল ঘাস জঙ্গল ইঁট পাটকেল ঠেঙিয়ে আসছেন কর্তা। সঙ্গে কালকের সেই ছেলেটা। ভাইপো না নাতি-টাতি কে জানে।

কেশব গাড়ি থেকে নেমে পড়ে প্রথম কথা বলে উঠল, একী স্যার, রাত্রে মশারির মধ্যে শোননি?

মশারির মধ্যে! রাত্রে শুয়েছিলেনই কি আদৌ?

তিলক হাসলেন বললেন. কেন বলতো?

কেন আর? সারা মুখে মশার কামড়ের দাগ! ছি ছি! কানাইবাবুর ওখানে ডিজেলে আলো পাখার ব্যবস্থা ছিল।

তা থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতদের বাড়িতে এখন অনেক সুখ, সমৃদ্ধি।

তিলক বললেন, গ্রামের সকলের ঘরে ঘরে আলো পাখার ব্যবস্থা করে দিতে না পারা পর্যন্ত আমাদেরও সে আরাম ভোগ করা ন্যায্য নয় কেশব।

কেশব মনে মনে ঠোঁট উল্টে বলল, এখানেও লেকচার। মুখে বলল, মশার কামড়টা তো শুধু মুখের বাহারই নষ্ট করে না স্যার! হাড়ে দুঃখো

গজিয়ে ছাড়ে যে। শরীরটা ঠিক রাখার দরকার তো আগে। তো সে যাক। আজ সকালের দিকেই বোধহয়, ভাঙরাপাড়া আর পলাশপুরটা সারবার কথা ছিল, তাই না ?

তিলক হাসলেন, সকালটা তো আর পালিয়ে যায়নি ? এই তো সবে সাতটা চল্লিশ।

না, মানে, রেডি হতেও তো কিছু সময় লাগবে !

আমাদের সবসময় রেডি থাকাই নিয়ম কেশব। রেডি হতে অনেক সময় লাগবে কেন ?

অরুণ গাড়িতে হাত দিযে দাঁড়িয়েছিল, পলাশপুর শব্দটা শুনেই একটু চকিত হয়ে বলে উঠল, কাল পলাশপুরের যে একজন ওখানে ছিলেন, তিনি বলছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি না। তো আমি তো জানিই না।

এরকম কথা শত লোক বলতে পারে, তিলক জীপে উঠে পড়তে পড়তে অলসভাবে বললেন, কী রকম লোক ? নাম কী ?

নাম জানি না। একজন ইয়ে মেয়ে !

মেয়ে !

হ্যাঁ ওই যে দেবেশবাবুর বৌয়ের সঙ্গে রান্নাটান্না করছিলেন।

তাই নাকি।

সোজা হয়ে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠলেন তিলক, আর কী বলেছিলেন ?

আর কিছু না। মানে ভেবেছিলেন আমি বুঝি ওবাড়িরই ছেলে। তাই—তো আমি তো—

গাড়ি ছেড়ে দিল।

তিলক বললেন, খাবার সময় কাল দেখলাম বটে, কে-একটি মেয়েকে মিসেস ঘোষকে হেল্‌প করছেন। জানেন না কি ?

কানাই পালের ছেলে বলল, নাম জানি না। শুনলাম মিসেস ঘোষের স্কুলেরই অন্য একজন দিদিমণি ! পলাশপুরের কোন্‌ এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের নাতনী। লোকে নাকি বলে পাগলা ডাক্তার। দেবেশবাবুর বাবা গল্প করছিলেন।

তিলক সম্পর্কে একটু আগে যে সমালোচনা চলছিল, তা মিথ্যা নয়।

কোনো একটা তুচ্ছ ব্যক্তিকে যে তিনি হঠাৎ বিশেষ লক্ষ্য দিয়ে বসেন এবং কেষ্ট বিষ্টুদের ব্যাপারে সবসময় নয় তা নয়, সেটা বোঝা গেল ওই পাগলা ডাক্তার সম্পর্কে কৌতূহল দেখে।

'পাগলা ডাক্তার' কেন ?

কানাই পালের ছেলে আলগা গলায় বলল, লোকটা নাকি হোমিওপ্যাথি নিয়েই নানা এক্সপেরিমেণ্ট করে পাগলামী করেছে আগে আগে। জল চিকিৎসা, সৌর চিকিৎসা, এটা ওটা। এখন তো বুড়ো হয়ে গেছে। তবে সবাই পাগলা ডাক্তারই বলে। গ্রামোন্নয়ন-টয়নও করেছে। তা যে সব লোক এইসব নিয়ে মেতে থেকে জীবন কাটায় লোকে তাদের পাগলাই বলে।

কথাটা সত্যি। পাগলা ডাক্তারের আসল নামটা যে কী, সেটা লোকে ভুলেই গেছে। তবে এই পাগল নামটা অশ্রদ্ধাসূচক নয়। অনেকে যেমন সাধুসন্ত গুরু টুরুর নামের সঙ্গে 'ক্ষ্যাপা' কী 'পাগলা' শব্দটা জুড়ে দিয়ে বলে, 'ক্ষ্যাপাবাবা' বা 'পাগলাঠাকুর' অনেকটা তেমনি।

পাগলা ডাক্তাব স্থানীয় লোক নয়। কোথা থেকে যেন এসে এই 'পলাশপুর' জায়গাটায় রয়ে গেছেন। তা রয়ে গেছেন অনেককাল। যখন এসেছিলেন, তখন পলাশপুরের ত্রিসীমানার কোথাও হাসপাতাল ছিল না, পাশকরা ডাক্তার তো স্বর্গীয় স্বপ্নস্বপ্ন। রোগ সারতো, অথবা রুগী মারতো, টোটকায় আর দৈবওষুধে। হাতুড়ে একজন ছিল, ফোঁড়া কাটতে, আর ছেঁচে কুটে কেটে ছড়ে গেলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে।

এছাড়া গ্রামের পাদিপিসিরাই শেষ ভরসা।

কাছের সদর থেকে আসতে যেতে হাঁটাই একমাত্র উপায়। গোরুর গাড়ি চড়বার মত বড়লোক আর কটা ছিল তখন ?

পাগলা ডাক্তার অবশ্য গোরুর গাড়ি চেপেই এসেছিলেন, তাঁর জিনিসপত্র ওষুধের বাক্স আর বইয়ের বোঝা নিয়ে। কিন্তু তিনি কি নিজের ভাগ্য ফেরাবার আশায় এসেছিলেন, না এই হতভাগ্য গ্রামের আরো হতভাগ্য লোক-গুলোর ভাগ্য ফেরাতে ?

তা সেকথাও এখন ভুলে গেছে লোকে।

তবে তখন লোকেরা এই দিব্যকান্তি ডাক্তার আর বিনিপয়সায় দিব্যসুন্দর ওষুধ পেয়ে পেয়ে ওনার নাম উঠলেই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকাতো।

এখনো যে সে সমীহভাব একেবারে নেই তা নয়, তবে এযুগের কৃতজ্ঞতা, আর সমীহ প্রকাশ্যে বড় কৃপণতা।

প্রথমযুগে ডাক্তার মাঝে মাঝেই, যাতায়াতে অনেক ক্লেশ স্বীকার করে কলকাতায় গিয়ে ওষুধপত্তর আর বইপত্তর নিয়ে আসতেন, আর অলক্ষ্যে হলেও, বোঝা যেতো অনেক টাকাপত্তরও নিয়ে আসতেন। কারণ এখানে যতটা শীঘ্র সম্ভব তরুণ ডাক্তার যেভাবে তার বসবাসের যোগ্য ব্যবস্থা করে নিচ্ছিল তা টাকার খেলা ছাড়া আর কী? যাকে বলে বন কেটে বসত।

ছেলেটা যে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এভাবে এই জলাজঙ্গল মশা ম্যালেরিয়ার গাড্ডায় বাস করতে আসছে। রহস্য!

তবে লোকে রহস্য উদ্‌ঘাটনে যত্নবান হবে না তা তো নয়। হলো, এবং ক্রমশ জানতে পারলো, 'অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে' নয়, ভাগ্নে। মা বাপহীন ছেলেটা মানুষ হয়েছিল দিদিমার কাছে, দিদিমা মরতে অতঃপর অকৃতদার মামার কাছে। মামা যথেষ্ট বিত্তবান এবং আদর্শবাদী। ভাগ্নেটিকে আপন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে মানুষ করেছেন। মাঝে মাঝে মামার কাছ থেকেও রসদ আহরণ করে আনার এই ব্যবস্থা।

সন্ধান নিয়ে এও জেনে ফেলল লোকে, ডাক্তার 'হোমিওপ্যাথী' করলেও রীতিমত মেডিকেল কলেজের পাশকরা ডাক্তার। এই গরীব দেশের ততোধিক গরীব গ্রামে, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়া পরিহাস মাত্র, এই বিবেচনায় এই ব্যয়হীন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আরো জানা গেল, পলাশপুর ডাক্তারের মাতুলালয়ের গ্রাম, এইসব জমিজমা, জলাজঙ্গল পানাপুকুর যেটাকে লোকে 'বটুকের পোড়োভিটে' বলে চিহ্নিত করতো, সেই 'বটুক' ডাক্তারের মাতুল বংশের পূর্বপুরুষ। তা মাতুল এখন বংশের একমাত্র পুরুষ, এবং প্রৌঢ় ও অকৃতদার, কাজেই বংশের উত্তরাধিকারী এই ডাক্তারবাবু। যাকে তার মামা ডাক্তারী পড়তে যাওয়ার প্রারম্ভে বলে ছিলেন 'ডাক্তারী পড়তে চাও কেন; রোজগার করতে, না মানুষের সেবা করতে?'

ভাগ্নে বলেছিল দ্বিতীয়টা।

ঠিক আছে। তবে সেবার ক্ষেত্র বেছে নিও দেশের হতদরিদ্র পল্লীগ্রামগুলি। যেখানে শত শত মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরে।'

ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে প্রথম হাত দিলেন, এই হাতের মুঠোয় পাওয়া গ্রামটাতেই মহামতি হ্যানিম্যানকে সহায় করে।

তা' তাতেই যে কিছু কম উপকার হয়েছে তা নয়।

বিনা ওষুধে বেঁচে মরে থাকা লোকগুলোর সোঁদা শরীরে দুটো চিনির গুলি, দু ফোঁটা জলই—মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছে।

তাছাড়া শুধুমাত্র তো ওষুধই নয়, পাগলা ডাক্তার তো পরিবেশ দূষণের প্রতিকারেও আপ্রাণ সাধনা চালিয়ে চলেছিল। সে ব্যাপারে কিছু লোক যথা নিয়মে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিকূলতা ধোপে টেঁকেনি। যে ডাক্তার নিজে থেকে রুগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেয়, এবং অবস্থা বুঝলে শুধু ওষুধই নয়, পথ্যিও গুঁজে দিয়ে আসে, তার সম্পর্কে 'মতলব, 'অভিসন্ধি' এসব সন্দেহজনক শব্দগুলো কাজে লাগানো যায় নি।

ডাক্তারের পরণ পরিচ্ছদও ছিল অন্য ধরনের। সাধারণের মত ধুতি পিরাণও নয়, ডাক্তারসুলভ কোট পেন্টুলও নয়, অনেকটা পাদ্রীসাহেবদের মত গলাবন্ধ শাদা লংকোট এবং পায়জামা। কোটের আড়ালে পায়জামা অদৃশ্য। পায়ে কেডস। তাছাড়া এই রাস্তাহীন জায়গায় রাস্তা হাঁটাতো সহজ নয়। সারা গ্রামটাই তো চষে বেড়াতেন হেঁটে হেঁটেই। পরে একটা সাইকেল করেছেন, তারপর একটা এক ঘোড়ার টমটম জাতীয় গাড়ি।

তখন গ্রামের ছেলেরা বলতো 'পাদ্রী সাহেব।'

হাঁটা পথে আসা দীর্ঘকায় লোকটাকে দেখতে পেলেই বলে উঠতো ছেলেরা, 'পাদ্রী সাহেব আসছে! পাদ্রীসাহেব আসছে। পাদ্রী সাহেব সেলাম '

ডাক্তার চটপট এগিয়ে এসে বলতো, আমায় তোরা 'সাহেব' বলিস কেন রে;

তুমি তো সাহেবের মতনই। অ্যাতো ফর্সা!

ফসা কীরে? কালো ভূততো।

আহা, সে রোদে ঘুরে ঘুরে! আসলে গাঁয়ের মধ্যে ফর্সা।

ফর্সা হলেই সাহেব হলো?

পাদ্রীরা তো সাহেবই হয়।

কিন্তু আমি তো ডাক্তার মানুষ, আমার পাদ্রী বানাচ্ছিস কেন?

তুমি এরকম জামা পর যে।

এ-তো ডাক্তাররাও পরে। কলকাতায় চল, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব।

তবে তোমায় 'পাদ্রী সাহেব' না বলে 'পাদ্রী ডাক্তার' বলব।

তবু খোট ছাড়বিনে ?

ডাক্তারের হা হা হাসি আকাশে উঠতো।

আসলে নিঃস্বার্থ এই সেবার সঙ্গে ডাক্তারের একক জীবনটা 'পাদ্রী সাহেবের' তুলনা গ্রামের মানুষের মনের মধ্যেই বোধহয় সঞ্চিত হচ্ছিল, শিশুরা তারই প্রতিধ্বনি করেছে।

সেদিনের সেই শিশুরা অবশ্যই এখন প্রৌঢ়, আজকের কথা তো নয় !

তবে হঠাৎ একদিন সেই 'পাদ্রী' ত্বটি ঘুচিয়ে বসলো ডাক্তার বছর দশেক এইভাবে গ্রামটাকে নিয়ে লেগে পড়ে থাকতে থাকতে। বুড়ো বয়েসে একবার কলকাতা থেকে ফেরার সময়, বিয়ে করে ফিরল নতুন কনে সঙ্গে নিয়ে।

ডাক্তারের বয়েস তখন বছর পঁয়ত্রিশ।

পঁয়ত্রিশ বছরটা কি যুবার না বুড়োর ?

তা গ্রামে গঞ্জে তখনকার দিনে বিয়ের পক্ষে একেই 'বুড়ো বয়েস' বলতো। খেতে পরতে পাক না পাক, বিয়ের বয়েস হলেই বিয়ে করা এবং বংশবৃদ্ধি করে চলাই বিধি। তা সে বয়েস তো ডাক্তারের তখনই হয়েছিল, যখন ডাক্তারী পাশ করে এখানে এসেছিল। তারপর দশ বছরব্যাপী এই পাদ্রী-সুলভ জীবনযাপন।

বিয়ের পর সামান্য একটু রং চটলো লোকের মন থেকে, চিড় খেলো কিছু কিঞ্চিৎ। তার ওপর আবার যখন দেখা গেল বছর ঘোরার আগেই ডাক্তার একটা খুকির বাবা হয়ে বসেছে। বৌ মেয়েও অবশ্য এলো কলকাতা ঘুরেই ! মাসে তিনেক আগে বৌকে কলকাতায় রেখে এসেছিল, নিয়ে এল মেয়ে মাস খানেকের হতে ! খুব সম্ভব বৌয়ের বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিল বৌকে।

কিন্তু যতো যাই হোক, সেবা কর্মে কোনো ত্রুটি ঘটেনি ডাক্তারের। ঠিক একইভাবে রুগীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তত্ত্ব তল্লাস নেওয়া, যখন তখন আকাশ ফাটানো হাসি, আর পারিপাট্যহীন সেই সাজ। একবারই শুধু মামা মারা যাওয়ার খবরে স্ত্রী কন্যা সহ কলকাতায় চলে গিয়ে, সেখানের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে। তবে এমনি ফেরেননি, আপ্রাণ চেষ্টায় পলাশপুরে একটা সরকারি হাসপাতাল খোলাবার আয়োজন পাকা

করে এসেছিলেন এবং তারপর লেখালেখি করে তাকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিলেন।

পলাশপুর যে এখন একটি রেলওয়ে স্টেশন, সেও পাগলা ডাক্তারের 'মরীয়া' চেষ্টায়। এক কথায় পঞ্চাশ বছর ধরে যেন এই গ্রামটাকে নিয়েই সাধনা করে এসেছেন ডাক্তার। সেই তার পঁচিশ বছর বয়স থেকে।

পলাশপুর এখন এ অঞ্চলে সবথেকে সমৃদ্ধ গ্রাম! পলাশপুরের ছেলেদের জুনিয়ার হাইস্কুলটা এখন বয়েজ 'হাইস্কুল' হয়ে গেছে এবং মেয়েদের জন্যও একটি স্কুল খোলা হয়েছে। ডাক্তারই প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলটা ডাক্তারের দিদিমার নামাঙ্কিত হয়ে ভূমিষ্ট হয়েছিল। 'দয়াবতী দেবী গার্লস স্কুল।' 'হাই' হয়নি অবশ্য এখনো। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার এখনো এই বয়েসেও।

ডাক্তারের অভিমত ছিল, যাঁর টাকায় এতো লপ্‌চপানি, তাঁর মায়ের নামটা থাকবে না একটু? মামার মা তো বলতে গেলে আমারও মা।'

এই 'পলাশপুর দয়াবতী দেবী গার্লস স্কুলেই' দেবেশ ঘোষের স্ত্রী প্রধানা শিক্ষিকা। মাসিক ভাড়ায় ব্যবস্থা করা সাইকেল রিক্সায় নিত্য যাতায়াত 'দক্ষিণ মতিগঞ্জ' থেকে।

গতকাল যে মেয়েটি মিসেস লতিকা ঘোষের বাড়িতে হাতে হাতে সাহায্য করছিল, সেও ওই স্কুলেরই একটি শিক্ষিকা। তবে তাকে যাতায়াতে নিত্য বেশী খাটতে হয় না। স্কুলের কাছেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী পাগলা ডাক্তারের বাড়ি। পাগলা ডাক্তারের নাতনী সে। ডাক্তারের বাড়িতেই তো তার স্থিতি।

তিলক বললেন, মেয়েটি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়,, বলেছিল কিছু?

কেশব মনে মনে ভাবল, এই হলো আরম্ভ। তুচ্ছকে উচ্চ মূল্য দিতে বসা। উদাস উদাস গলায় বলল, কেন আর? কিছু আর্জি আছে নিশ্চয়। বিনা দরকারে, 'শুধু একটু 'দর্শন' করতে তো কেউ আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যায়না স্যার।

তিলক হাসলেন। বললেন, কার সঙ্গেই বা যায়? দেব দর্শন করতেও তো আর্জি নিয়েই ছোটে মানুষ।

কেশব আবার মনে মনে মুখ বাঁকিয়ে বলল, তত্ত্বকথা। যিনিই একটু বড় হয়ে যান, ভাবেন তত্ত্বকথা বলার রাইট আছে তাঁর।

বাইরে এমন ভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন তিলক, যেন গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখছেন।

জীপ ছুটে চলেছে।

এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি কেশব ?

আজ্ঞে! 'ভাঙোড়' না কী যেন নাম বললেন মিষ্টার পাল।

হ্যাঁ ভাঙোড়।' এখন ওখানে গিয়েই সকালের সভাটা সেরে নেওয়া তারপর পলাশপুরে গিয়ে লাঞ্চ সেরে, বিকেলে সভা।

আঃ! এই এক লাঞ্চের গাড্ডায় পড়া! তার মানে ঘণ্টা কয়েকের মত। তাছাড়া সেই তো আপনাদের রাজসূয় ব্যবস্থা ? খুব অস্বস্তির ব্যাপার!

কানাই পালের ছেলেই এখন এদের সফরে গাইড।

সে হেসে উঠে বলল, এখানে বোধহয় আপনার সে ভয় নেই। পাগলা ডাক্তার শুনেছি খুব শাদামাঠা। হয় তো শুধুই ডাল ভাত আর নিজের পুকুরের চারা পোনা দিয়েই কাজ সারবে। শুনেছি ওর বাড়িতে না কি নীতি সদাব্রত। কিন্তু ওই ডাল ভাত আর পুকুরের মাছের দু'এক টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। বাহুল্যের দিকে নেই। তা'সে রাজাই যাক আর প্রজাই যাক। তিলক যে কেন এই পাগলা ডাক্তার সম্পর্কে এমন উৎসাহী হয়ে উঠলেন কে জানে। হয়তো বা কেশবের মনোভাব অনুমান করে কৌতুকই। কেশব যতই যে সম্পর্কে তাচ্ছিল্য ভাব পোষণ করে তিলক ততই সেই সম্পর্কে আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখান।

অতএব এখন বলে ওঠেন, বাঃ। এরকম একটা প্রিন্সিপলে চলা তো খুবই ভাল।

কেশব ভারী মুখে বলে, তা ঠিক।

তিলক কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা চিন্তার আলোড়ন, মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে কেন ? মেয়েটিকে কি আমি কোথাও দেখেছি ? কেন একথা মনে হচ্ছে ?

খুব তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। কি জানি, হয়তো কলকাতা থেকে লেখাপড়া করেছে মেয়েটি। তাছাড়া আর কী করবে ? পলাশপুর-মতিগঞ্জ ভাঙোড় এ সবের মধ্যে মেয়েদের কলেজ কোথায় ?

আমরা আশাকরি যে হাতে কিছু ক্ষমতা পেলে আমরা এই সব অভাব দূর করব। গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হাসপাতাল, বিদ্যুৎ, রেললাইন এসব এনে দেব ; আরো কত কীই করব ভাবি। কিন্তু আমাদের এই ভাবনার মধ্যে কী অসততা থাকে ? থাকেনা আন্তরিকতা ? তা তো নয়। মনে হয় একটুখানি 'ক্ষমতা' বুঝি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত। বিশ্বাস করি একথা, আর বিশ্বাস করি বলেই অভাবগ্রস্ত অসুবিধাগ্রস্তদের ডেকে ডেকে আশ্বাস দিই। কিন্তু তারপর ? কোনো প্রতিশ্রুতিই তো প্রায় পালন করে উঠতে পারিনা আমরা। কারণ কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখি, সামনে চড়াই সামনে কাঁটাবন, সামনে অগাধ সমুদ্র।

অথচ ওই পাগলা ডাক্তার নাকি এই পলাশপুরের চেহারা বদলে দিয়েছে।

এইযে, এসে গেছি।

জীপটা থামলো।

তিলক তালুকদার একটু অবাক হয়ে তাকালেন। তবে যে ওরা বলছিল, পলাশপুরের খুব চেকনাই। এই ধূসর মাঠ, এবড়ো খেবড়ো পথ, সবুজের সমারোহহীন দৃষ্টি অনন্দন দৃশ্য!

কি হল পালমশাই, বলছিলেন যে পলাশপুরের অবস্থা খুব ফিরে গেছে ?

কানাই পালের ছেলে বলাই বলে ওঠে, প্রথমে তো ভাঙোড়ে আসবার কথা।

ও হো হো!

তিলক লজ্জিত হলেন। বললেন, খেয়াল ছিলনা।

মনে মনে একটু আশ্চর্যই হলেন। বারে বারে এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন কেন! কেবলই কেন মনে হচ্ছে কিছু যেন একটা হতে চলেছে। কী যেন একটা প্রত্যাশা রয়েছে মনের মধ্যে!

ভাবলেন, আর কিছুনা, গগনপুরের সেই সেন্টিমেন্টের ছোঁওয়া! ওই যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল তিলকের দিকে, ওদের জন্য বোধ হয় আরো কিছু করার ছিল। ভাবতে পারলেন না, কিন্তু কেন ?

জীপ এগোচ্ছে। একই ধরনের ক্লান্তিকর দৃশ্য বহন করে। রোদে ঝলসানো মাঠ, মাঝে মাঝে পানাভর্তি পুকুর, তবু তারই পাড় কেটে দু একটা

মেটে সিঁড়ির ধাপ, সেখান দিয়ে নেমে এসে পানা সরিয়ে সরিয়ে কাজ চলছে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা। প্রত্যেকটা লোক প্রতিদিন যদি একমুঠো করে পানা টেনে তুলে ফেলে দেয়, পুকুর পরিস্কার হয়ে যায়।

হঠাৎ একটা উল্লসিত কণ্ঠের শব্দে চকিত হলেন তিলক।

কানাই পালের ছেলে বলাই পাল বলে উঠেছে, আরেব্বাস! পলাশপুরে ঢোকবার আগে থেকেই যে দেখছি, জায়গাটা গোরুর গাড়ির চাকায় মুড়ে দিয়েছে।

প্রথম শ্রান্তি অপনোদনের ব্যবস্থা পলাশপুর বয়েজ হাইস্কুলে। সেখানে চা এবং ডাব দুরকম ব্যবস্থাই আছে, কর্তার যাতে রুচি।

এরপর স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আবেদন করে রেখেছেন, কিছুটা সময় তাঁদের জন্যে দিতে হবে, কিছু বক্তব্য রাখবেন তাঁরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও আছেন তাঁদের সঙ্গে।

বলাই পাল গলা নামিয়ে বলল, অন্য কিছু না স্কুল বাড়িটার যাতে বাড়বাড়ন্ত হয়, সেই তাল!

তিলক বললেন, সে তো হওয়াই দরকার। এখন তো সব শ্রেণীর মানুষই ছেলেকে স্কুলে দিতে চায়।

একজন শিক্ষক শুনতে পেয়ে একটু হাসলেন। বললেন, চায় আবার চায়ও না। বাড়ির কাজের জন্য আটকে রাখতে চায়।

সেই তো সমস্যা। এসব জায়গার কথাতো ছেড়েই দিচ্ছি কলকাতাতেও তো একই অবস্থা, বস্তির ঘরে ঘরে দেখবেন বাচ্চাদের পড়তে পাঠাতে নারাজ! মাইনে লাগবে না, বই খাতা কিনতে হবে না, এসব শুনেও বলে, বুঝলুম তো সব। তো পেটগুলো চলবে কী করে সেটা বলে দিন।

এই ধরনের সমাজচিন্তামূলক কথার মাঝখানে একটা ছোট ছেলে এসে মাষ্টারকে কী বলল।

মাষ্টার তিলককে উদ্দেশ করে বললেন, এখানের মেয়ে স্কুলের এক টীচার সীমা রায়, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছেন।

তিলক তালুকদারের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ দুলে উঠল। মনে হল, তখন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে আছেন বোধহয় এইটির প্রত্যাশায়।

সীমা রায় যদিও একজন স্কুল শিক্ষিকা, এবং বয়সেও নিতান্তই তরুণী বলতে গেলে 'বালিকা' নামের গণ্ডিটি সবে অতিক্রম করেছেন। তবু স্থানীয়

রীতিতে হট্‌করে পুরুষ মহলে এসে ঢুকে পড়েন নি, বাইরে অপেক্ষা করছেন। এ লজ্জা পুরুষদেরই অস্বস্তি থেকে বাঁচাতে। আসলে মফস্বলের দিকে এই ধরনের লজ্জা এখন মেয়েদের থেকে পুরুষদেরই বেশী। অর্থাৎ রক্ষণশীলতাটি আঁকড়ে ধরে আছেন পুরুষরাই।

তিলক বললেন, দেখি মেয়েটি কী বলতে চায়।

বেরিয়ে এলেন। স্কুলের দাওয়ার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। দেখামাত্র সরে এসে পায়ের ধুলো নিল।

তিলক 'থাক থাক' বলে বললেন, ওখানে এখনো আলোচনা চলছে। আপনি একটু অপেক্ষা করতে পারবেন ?

সীমা রায় বলল, আমার কথামাত্র এক লাইন।

তিলক হাসলেন, তাই না কি ? তার জন্যে এতো কষ্ট করে—বলুন তাহলে আপনার সেই লাইনটি।

আমায় 'আপনি' করে বলবেন না।

আচ্ছা বলব না। তোমার এক লাইনের অর্ধেকটা কিন্তু কাটা গেল।

মেয়েটি হেসে ফেলল। তারপর বলল, এখানের ডাক্তার-বাবু আমার দাদু—

তা শুনেছি। অতঃপর ?

সীমা লজ্জিত হাসি হেসে বলে, আমার দিদিমা বলতে বললেন, তাঁর নে । আপনাকে একটু সময় দিতে হবে। অন্যথা করবেন না।

দিদিমা।

তিলক অথৈ জলে পড়লেন।

এটা আবার কী! বললেন, কেন বলতো ? উনি কি আমায় চেনেন ?

তা জানিনা। শুধু এইটুকুই বিশেষ করে বলতে বলেছেন।

তিলক বললেন, তা শুনলাম তো তোমাদের বাড়িতেই দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। সেখানেই দেখা হবে।

সে তো অনেক লোকের সঙ্গে। মীটিংয়ের পর যদি একা একটু খানির জন্যে—মানে সন্ধ্যার পর।

তিলক ঈষৎ বিপন্ন ভাবে বললেন, তখনতো ফেরার তাড়া, কারণটা কী বলতো ?

সীমা রায় মৃদু গলায় বলল, তাও জানিনা।

তিলক ওই কচি আমপাতার মত গায়ের রং রোগা পাতলা মেয়েটার তিরতিরে মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেন, তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটু হাসির সুরে বললেন, কিছুই তো জানোনা দেখছি। তা' দিদিমার নামটা জানো তো? না কি তাও জানোনা?

সীমা রায়ও হেসে ফেলে বলল, তা জানি! কিন্তু বলতে মানা।

অদ্ভুত তো! নাম বলতে মানা, অথচ—

না, মানে বললেন, দেখি, দেখে চিনতে পারে কি না।

চলে গেল তাড়াতাড়ি। আলোচনার মধ্যে থেকে ডাকিয়ে এনেছে, লজ্জা করছিল।

ও চলে গেল। কিন্তু তিলক দাঁড়িয়েই রইলেন!

একী এক জেদি ধাঁধার উত্তর চাওয়া।

তিলক তালুকদার কি চল্লিশ বছর আগে মারা যাওয়া একটা মানুষকে চিনতে চেষ্টা করতে যাবেন?

কী হাস্যকর প্রত্যাশার মূঢ়তা তিলকের।

পাগলা ডাক্তারের বাড়িটা একতলা বটে, তবে ছড়ানো ছিটোনো অনেকখানি। কাঠের গেট ঠেলে ঢুকলে সামনেই ছোট একটি ফুলের বাগান। বাগান পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলেই চওড়া দালান, দালানের দুধারে ঘরের সারি। এতো ঘরে কে থাকে কে জানে।

ভিতর দিকে আর একটা বড় দালান কোঠা, যেখানে অতিথিদের খাওয়ার ব্যবস্থা। তা দালানটা এতোই বড় যে, সামান্য জনা ষোলো আঠারো লোকের খেতে বসা কিছুই নয়।

খেতে বসে দেখতে পেয়েছিলেন তিলক এই দালানের একপ্রান্তে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু তখন ভাবতে পারেন নি, ছাদটাই পাগলা ডাক্তারের ,মস্ত বৈঠকখানা।'

বাস্তবিকই তাকে এ গৌরব দেওয়া যায়। প্রকাণ্ড ছাদের একাংশে আলটুকটুকে সিমেন্টের বাঁধানো চওড়া চওড়া বেদি, সরু সরু বেঞ্চ মত এমন ভাবে তৈরী। মনে হবে সোফা, সেটি 'ডিভ্যান' সেন্টারপীস্ দিয়ে ড্রইংরুম সাজানো।

সীমার সঙ্গে এইখানেই উঠে এলেন তিলক। আর ভাবলেন, সাধে কি আর লোকে 'পাগলা' বলে। পরিকল্পনা বটে একখানা।

বাতাস বইছে হু হু করে। গ্রীষ্মকালের এই সান্ধ্য হাওয়াটি কত মনোরম তা এধরনের বাইরে না এলে বোঝা যায় না।

এই মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় খোলা আকাশের নীচে, এলোমেলো বাতাস আর দূরের গাছপালায় সেই বাতাসের মাতামাতি, যেন একটি অলৌকিকত্বের আভাস এনে দিয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিলক।

দেখলেন একটা বাঁধানো বেদির ওপর চওড়া পাড় শাদা শাড়ি পরা এক পাতলা ছিপছিপে মহিলা। যাঁর গঠন ভঙ্গীতে এখনো যেন কৈশোরের ছাপ।

সেই মুহূর্তেই বুঝে ফেললেন তিলক, সীমা রায়ের দিদিমার নাম কী।

কাছে সরে এলেন।

এই ঝোড়ো বাতাস বিদীর্ণ করেও অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হলো, দিদি!

মহিলা রোগা রোগা একটি হাত বাড়িয়ে তিলকের একটি হাত ছুঁয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় আস্তে বললেন, আয় বোস।

ছাতের অন্য একধারে পঁচাত্তর বছরের যুবা-পাগলা ডাক্তার দীর্ঘ সতেজ সোজা শরীরটা নিয়ে পায়চারি করছিলেন, কাছে সরে এসে উৎফুল্ল গলায় বলে উঠলেন, কী হলো? নাম লুকিয়ে রেখে কিছু লাভ হলো? ঠকাতে পারলে?

ডাক্তার গৃহিণী তেমনি কাঁপা গলাতেই উত্তর দিলেন, এটাইতো লাভ হলো।

ডাক্তার বলে উঠলেন, তবে হ্যাঁ আমায় ঠকিয়েছো। একবারের জন্যে বলোনি।

ডাক্তারের বৌ হাসলেন, বলব কী বলো? যদি নিজেই ঠকে যাই। একই নামে নাম লোক তো সংসারে আরো থাকতে পারে।

তিলক তার দিদির পাশেই বসে পড়েছেন।

আবেগ মুগ্ধ গলায় বললেন, আপনার এই জায়গাটি কী অদ্ভুত সুন্দর ডাক্তারবাবু

ডাক্তার মহোৎসাহে বলে উঠলেন, উমা! দেখলে? কেবলই যে বলে এসেছ, অতিথিকে ছাতে নিয়ে এসে বসাবার প্রস্তাবটাই হাস্যকর। কই হাসল তোমার ভাই?

হাসবে কী! এ কি হাসার অবস্থা?

বত্রিশ বছর আগে মারা যাওয়া একটা মানুষকে জলজ্যান্ত একটি রাজসিংহাসনে বসে থাকতে দেখবার জন্যে পরিবেশটি বুঝি এমনই হওয়া প্রয়োজন ছিল।

কথা নেই কারো মুখে।

শুধু উমার কাট হালকা আঙুল কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠা তিলক তালুকদারের একটা কব্জি কব্জা করে বসে আছে। আর তিলকের পুরু ভারী হাতের থাবাটা সেই হাতের ওপর চেপে বসে আছে।

ডাক্তার বললেন, আমি কী নীচে নেমে যাব?

সে কী? কেন?

এই আপনাদের দুই ভাইবোনের স্মৃতির সমুদ্রকে যত ইচ্ছে উথলোতে সুযোগ দিতে।

কী আশ্চর্য! না না! ভাবছিলাম আপনার এই অপূর্ব ড্রইংরুম পরিকল্পনার জন্যে অভিনন্দন জানাবো।

আমাকে!

ডাক্তার জোরে হেসে উঠলেন। যে হাসি শুনে মনে হলো না ডাক্তারের বয়েস পঁচাত্তর ছুঁয়েছে। হেসে উঠে বললেন, একেই বলে ভাগ্যবান। মুফতে ক্রেডিটটা পেয়ে গেলাম। মশাই এ পরিকল্পনাটি এই আপনার দিদির···কী মুস্কিল। এখন আর আমি আপনাকে আপনি আজ্ঞেই বা বলে মরছি কেন। পাকা দলিলতো হাতে পেয়েই যাওয়া গেছে। তুমি বলি, অ্যাঁ!

তিলক ব্যস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়!

হ্যাঁ তাই বলি! এ পরিকল্পনাটি ভাই এই উমারাণীর। ছাতে যে কী অদ্ভুত আকর্ষণ ওর! বরাবর। ভোরবেলা উঠেই চলে আসবে ছাতে। আর এই বিকেলের দিক থেকে রাত অবধি! 'ছাতে এসে চা খাব, ছাতে এসে আড্ডা জমাব, গেস্ট এলে তাকে ছাতে টেনে নিয়ে এসে বসাব।' তারপর মাথায় এই প্ল্যান খেলল। বাস, লাগাও মিস্ত্রি! দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এইসব

করানো হয়েছে গিন্নীর! আমি বলি, এখনো না হয় ছাতের আদর, গ্রামে বিজলী এসে গেলে, আলো পাখা ছেড়ে কে তোমার ছাতের বৈঠকখানায় বসতে আসবে শুনি? তা বলে কিনা, কেউ না আসে আমি একাই আসবো!

স্মৃতির সমুদ্রে ঢেউ আছড়ায় বৈ কি?

তিলকের মনে পড়ে যায় হাজার কাজে ব্যস্ত একটা কচি আমপাতা রঙ রোগা রোগা ছোট মেয়ে একটু অবকাশ পেলেই একটা আরো ছোট্ট ছেলেকে চুপিচুপি ডাক দিচ্ছে, ছাতে যাবি তিলু? চলনা ভাই!

সন্ধ্যার পর ছাতে ওঠা দেখতে পেলে গার্জেনদের তুমুল গর্জন শোনা যেত, এবং ঘোষণা করা হতো এই ছেলেমেয়ে দুটো নির্ঘাৎ পেত্নীতে পাওয়া। ছেলেটা তাই ভয়ে ভয়ে বলতো, না রে দিদি, বকবে!

টের পাবে না চলনা। আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখবি তারারা যেন সব নীচে নেবে আসছে।

তিলু অবশ্য তেমন কিছু বুঝতো না। তিলু শুধু দিদির ভাল লাগার দায়েই আসতো। সেই ছাতের মোহ এখনো আছে দিদির। কিন্তু কোন মন্ত্রবলে সেই দিদি একটি সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় উঠে এসে, বসে আছে তার নিজের পরিকল্পনায় গড়া ছাতের সিংহাসনে!

তুই আমায় কখন চিনতে পারলি তিলু! খাওয়ার সময়ে তো আমি ইচ্ছে করে যাইইনি।

তিলক একটু গাঢ় গলায় বললেন. হয়তো তোমার সীমাকে দেখেই প্রথম চিনতে পেরেছিলাম। দেখা মাত্রই কেবল মনে হচ্ছিল ওকে কি আমি কোথাও দেখেছি!

হ্যাঁ! সবাই বলে বটে, ও ঠিক আমার মত দেখতে হয়েছে।

তিলক বললেন, ও যখন বলল ওর দিদিমার নাম বলতে মানা, তখনই এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। মন বলছিল, আজ খুব বড় কিছু একটা পাবার রয়েছে। তারপর…

একটু হাসলেন তিলক তালুকদার। হাসি মাখানো অথচ গভীর গলায় বললেন, খেতে বসে নিঃসন্দেহ হলাম। একখানা পেল্লায় সাইজের পোস্তর বড়া দেখে! সভা সমাজে তো এটা—

ডাক্তার অপর একটা সিমেন্টের সোফায় বসে হাঁটু নাড়িয়ে চলেছিলেন।

(এটা নাকি তাঁর ব্যায়াম।) তবে কান সজাগ ছিল। বললেন, এটা কী ব্যাপার? ও উমারাণী, পোস্তর বড়া রহস্যটা কী?

তিলক আস্তে বললেন, দিদি বোধ হয় বলতে পেরে উঠবে না, কেঁদেই ফেলবে। আসলে ব্যাপাটা হচ্ছে কিছু মানুষের নীচতা আর নিষ্ঠুরতার এক টুকরো ইতিহাসের স্মৃতি।

বাতাসটা একটু নিথর হয়ে গিয়েছিল, গাছপালারা মাতামাতি ছেড়ে স্থির দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আবার হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে যেন সচেতন করে দিয়ে গেল।

ডাক্তার বলে উঠলেন, উমারাণী, আমি তো এই ভোট চাওয়া দাদাকে 'শালা' বলতেও পারি? মান হানির মামলা ঠুকতে পারবেন না!

উমা লজ্জিত গলায় বলল, আঃ কী যে বল তার ঠিক নেই। এতো বুড়ো হয়েও স্বভাব গেল না!

বাঃ! আমি কি বিধাতার নিয়ম উল্টে দেব। জানো না স্বভাব যায় না মরলে! তা যাক গে, সীমাকে ডেকে বলি চাটা এখানেই পাঠিয়ে দিতে।

উমার ওই কাঁদো কাঁদো ভাব দেখেই হয়তো ডাক্তারের এই পরিবর্তন।

তিলক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না না, চা নয়। চা লাগবে না!

কেন, খাওনা নাকি?

খাই যথেষ্ট, তবে এখন খাব না। এমন সুন্দর একটি রূপকথার রাজ্যের অ্যাটমোসফিয়ারে চা অচল!

তিলক তালুকদারের মুখে এমন আবেগের কথা কেশব কোম্পানী শুনলে অবাক হতো নিশ্চয়। তবু—বললেন। কিন্তু ভাবতে পেরেছিলেন কি আশ্চর্য একটা রূপকথার কাহিনীও শুনবেন তিনি এখন? শোনাবেন কাহিনীর নায়ক স্বয়ং রূপকথার রাজ্যের রাজা নিজে।

—'সে অদ্ভুত অবস্থা ব্যাটা ডাক্তারের বুঝলে ভায়া! কিছু ওষুধ পত্তর আনবার দরকারে কলকাতায় যেতে হবে, ভোরে বেরোবো! দরজায় গো গাড়ি মজুৎ! মাঝরাত্তির পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ গেছে, তাই বেরোবার আগে এদিক ওদিক দেখছি। হঠাৎ কোথা থেকে এক জলে কাদায় ভিজে চুপচুপে এলোকেশী মেয়ে পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ে বলে উঠল কিনা ডাক্তার-

বাবু, আপনি বলুন আমার কি কুষ্ঠ হয়েছে ? বোঝো ব্যাপার। কোথা থেকে এসেছে কীভাবে এসেছে গড্নোজ্'। ওই একটা কথাই বলে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে অনেক হেঁটে অনেক কষ্ট করে এসেছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ একটা মেয়ের মুখে এমন কথা কেন। পাগলটাগল না কিরে বাবা !···কিন্তু সে চিন্তা রেখে আগে তো মেয়েটাকে সুস্থ করা দরকার। সেই কাজেই লেগে গেলাম। ওদিকে গাড়োয়ান মহাপ্রভু তাড়া লাগাচ্ছেন। যাই হোক প্রাথমিক ব্যবস্থা করে, মেয়েটাকে নিজের একটা ধোবার বাড়ির ধুতি আর বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে সুড়ে বসিয়ে এবং গরম চা খাইয়ে কিছুটা চাঙ্গা করে দু, চারটে কথায় যা বুঝলাম, কেউ ওর মনের মধ্যে ওই ব্যাধির ভয়টি ঢুকিয়ে দিয়েছে ! অথচ নিজে বলছে, ওরা আমায় মিছিমিছি দোষ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে ! আমার অসুখ করেনি।······তা' বুঝলে ভায়া, ওই চিরকেলে পাগলার মাথায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল ! ভাবলাম এ স্রেফ ঈশ্বর প্রেরিত। নইলে এমন পাগলা ডাক্তার তার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে এমন একটা গিনিপিগ পেতো কোথায় ? বুঝতে পারছনা বোধ হয় ! তাহলে আরো বিশদ হই।'

আরো বিশদ হলেন ডাক্তার। তিনি তখন না কি প্রচণ্ড উৎসাহে সৌর-চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন। আয়ুর্বেদে কোথায় নাকি লেখা আছে সৌরচিকিৎসায় কুষ্ঠ সারানো সম্ভব। তার সঙ্গে পথ্যের অনুশীলন। এ বৃত্তান্ত পড়ে পর্যন্ত ডাক্তারের চিন্তা চলছে, কোথায় এমন একখানা রোগী পাওয়া যায় ! ভাবছেন···রোগটা হয়তো সত্যিই। তা নইলে এই বয়েসের একটা মেয়েকে কেউ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে ? তা ঈশ্বর প্রদত্ত একটা রুগী পেয়ে মন খুব খুশী ডাক্তারের। কিন্তু এই মুহূর্তের ব্যবস্থা কী ? ওদিকে দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। অতএব ঠিক করে ফেললেন, বিনা কাজে মেয়েটাকে কলকাতাতেই নিয়ে চলে যাওয়া যাক। সেখান থেকে পরীক্ষা করিয়ে তারপর সৌরচিকিৎসার সমারোহ চালানো যাবে।···নিয়ে চললেন সঙ্গে। গ্রামের সবাই যাবে। গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানটা অবাক হল। বলল, কে এ ?

'বৌ না বাবা ! একটা বেওয়ারিশ রুগী। কলকাতায় যাবে। নিয়ে গিয়ে তুললেন মামার কাছে। মামা নিরীক্ষণ করে দেখে বললেন, নাক-মুখ-একটু ফুলো-ফুলো লাগছে বটে। মেয়েটা কেঁদে ফেলে বলল, এ তো ওরা মেরে মেরে ফুলিয়ে দিয়েছে। মারতে মারতে বলেছে মরগে যা ?

কী আশ্চর্য, মারল কেন ? কে তারা ?

কিছু বলবে না সে মেয়ে। শুধু কাঁদবে। তবে এ সংকল্প ঘোষণা করেছে, সে মরবে না। বেঁচে থেকে দেখিয়ে ছাড়বে তার ওই সব অসুখ করেনি।

মামা আড়ালে গিয়ে বললেন, রাখ কিছুদিন। ওয়াচ করে দ্যাখ।

তা রাখা ছাড়া গতিই বা কী ? যাবে কোথায় ? তাঁরা মামা ভাগ্নে তো আর এই বয়সের একটা মেয়েকে বাড়ির বাইরে বার করে দিতে পারবেন না ?

কিন্তু কে জানতো মেয়েটা সেই রাত্তিরেই প্রবল জ্বরে পড়বে! এবং সে জ্বর নিউমোনিয়ায় দাঁড় করাবে। আটকে পড়তে হলো ডাক্তারকে কলকাতায়। মামা হৃদয়বান দয়ালু। যত্নের আর চিকিৎসার ত্রুটি হল না। তবে এই ডামাডোলে ধরা পড়ল মেয়েটার কুষ্ঠ নয়। রোগ 'অন্য'।

যত্নে আতিথ্যে সেরে উঠল তাড়াতাড়ি, এবং আসল রোগটা 'নিশ্চিত' হলো। মামা বলল, এই অবস্থায় একটা মেয়েকে নিয়ে তুই কোথায় নিয়ে বেড়াবি শম্ভো ? কোথায় বা রাখতে যাবি ? বদনামের গাড্ডায় পড়ে যাবি। তোর গ্রামসেবার বারোটা বেজে যাবে। তার থেকে এইবেলা মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলে, পলাশপুরে নিয়ে চলে যা!

বিয়ে করে ফেলে!

ভাগ্নে স্তম্ভিত হয়ে বলল, মামা জানতে চাই, আমি পাগল না তুমি পাগল ?

মামা বলল, আমরা কেউ না। আসল পাগল, সেই ব্যাটা ভগবান! কিন্তু আমি তো এছাড়া আর কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

চমৎকার সমাধান! তুমি জানো না আমার সংকল্প ? তার মধ্যে বিয়ে ফিরে আসে ?

মামা বলল, সংকল্পটা মহৎ, তবে বাস্তবে তেমন সুবিধে নয় বাপু! বুঝছিতো হাড়ে হাড়ে।

বুঝছো হাড়ে হাড়ে ?

তা মিথ্যে বলব না বাপু, বুড়ো হয়ে পর্যন্ত হাড়ে হাড়েই বুঝছি। তাই বলছি, কাজটা ভালই হবে।

মামা! মেয়েটার বয়েস কতো জানো ? আমার থেকে কমসে কম কুড়ি বছরের ছোট!

আরে বাবা, কুড়ি বছরের বড় তো নয়? ও ঠিক হয়ে যাবে। এ না হলে, মেয়েটাকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে হয়। সঙ্গে করে উদ্ধার আশ্রম খুঁজে বেড়ালেই লোকে তোকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বে!

বাঃ। যদি বলি আমার দূর সম্পর্কের বোন। ইয়ে হঠাৎ বিধবা হয়ে গেছে।

মামা হেসে উঠে বলেছে, উঃ। মাথা বটে একখানা। সমাধান খুঁজে বার করলি বটে একখানা। ওহে বৎস, দূরে কেন, নিকটই যদি বলিস! নো সুরাহা! 'মেয়ে' পাতালেও না। গ্রামের লোক এতো নিরীহ যে ছেড়ে দেবে! ও বাপু বিয়েই করে ফেল। যেটা পৃথিবীতে আসছে, তার একটা পরিচয়ও তো দরকার।

এইসময় উমা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অস্ফুটে বলে, মানুষ ছিলেন না! ছিলেন দেবতা!

ডাক্তার হেসে উঠে বলেন, তো আমার অবশ্য তখন তাঁকে বনমানুষ মনে হয়েছিল! রেগে চোখ বাড়িয়ে বললাম নিকুচি করেছে তোমার প্রবলেম সলভের। আমি যাচ্ছি আজই একটা উদ্ধার আশ্রম-টাশ্রম খুঁজে বার করতে। তো শুনলে বিশ্বাস করবে? শুনে তোমার এই নিরীহ ভালমানুষ দিদিটি আমার ওপর চোখ রাঙালেন।

চোখ রাঙালেন?

তা ছাড়া আবার কী! সোজা মুখের ওপর বলে দিলেন ওই আশ্রম-ফাশ্রমের চেষ্টার দরকার নেই, উনি মরে আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাবেন। চোখ রাঙানো ছাড়া কী বল? মামা শুনে হেসে হেসে বলল, কেমন জব্দ? হতভাগা ডাক্তারের অবস্থা বোঝো। যখন রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, তখন কী আর বলবো ভাই, 'শালা' সম্পর্ক তাই বলেই ফেলছি—তখন ধরে ফেললাম, শ্রীমতী উমারাণী, তার থেকে বয়েসে কুড়ি বছরের বড় আধবুড়ো একটা পাগলার প্রেমে পড়ে একেবারে ল্যাতপেতিয়ে বসে আছে।

উমা বলে উঠল, আঃ আবার!

কী করি বল! 'সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতে তো শিখি নাই।'

তিলক অনায়াসে তাঁর থেকে প্রায় বছর পঁচিশেক বড় লোকটাকেও সহাস্য বচনে বলে ওঠেন, আমি তো সত্যের অপলাপই দেখছি। তখনের কথা বাদ দিন, এখনই তো আপনাকে সিকি বুড়োও বলা চলে না।

একটা দরাজ হাসির শব্দে ছাতের বাতাস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাই না কি? ও উমারাণী, এ বলে কী।

সীমা উঠে আসে ছাতে। বলে ওঠে, বেশ দাদু খুব যা হোক; আমায় বাদ দিয়ে সব মজলিশটি হয়ে যাচ্ছে।

তা কী করব। এখানে নাবালকদের প্রবেশ নিষেধ। তুই তো একটু চা খাওয়ালি না।

বাঃ। তুমি যে বললে, ঠিক সময় বলব।

বলেছিলাম বুঝি? তাহলে বোধহয় এখনো ঠিক সময়টা আসেনি। বোধহয় আসবেও না।

ঠিক আছে। রাতে কখন খাওয়া দাওয়া হবে বল।

ইয়ে—ইস্কুল বাড়ি থেকে লোক এসেছে, ওখানেই না কি রাতের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা।

ডাক্তার বলে ওঠেন, ব্যবস্থা বানচাল। বলে দিগে প্রকাশ পেয়েছে ভোট বাবু আমার বিশেষ কুটুম্বু, এখানেই থাকবেন।

আচ্ছা বলে দিচ্ছি গিয়ে। তরতরিয়ে নেমে গেল সীমা।

তিলক সাবধানে বললেন, ওর মা বাবা।

উমা আস্তে বলল, ওর বাপের বদলীর চাকরী। আজ এখানে কাল সেখানে। লেখাপড়ার অসুবিধায় ও এখানেই মানুষ হয়েছে, আছে। ছুটির সময় যায়টায়। তারাও আসে।

তিলক একটু থেমে বলেন, আর ওর মামা মাসিটাসি?

ডাক্তার হেসে বলেন, সে ভাগ্য আর ওর হয়নি। ওর মা-টি জন্মকালে এমন একখানি দক্ষযজ্ঞ বার করেছিলেন ভবিষ্যতে পথ রুদ্ধ করে ছেড়েছিলেন।

না, বিয়ে দিতে কিছুই অসুবিধে ঘটেনি উমার মেয়ের। 'ডাক্তার শুভো মুখুজ্যের মেয়ের' বিয়ের আবার ভাবনা!

তিলক বললেন, আমি নিজেই না হয় একবার বলে আসি। নাহলে ভাববে তালুকদারের পেশাই দেখছি এই। যেখানে যায় রাতে খায়-দায়, থেকে যায়।

আরে আবার কোথায় এমন ঘটনা ঘটল?

তিলক হাসলেন, এই গতকালই তো থেকে গেলাম জন্মভিটের স্নেহময় জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

তিলু!

উমার শান্ত মৃদু কণ্ঠস্বর হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে বেজে ওঠে বলে, তুই কাল গগনপুরে গিয়েছিল? বাড়িতে ছিলি রাত্তিরে?

তা ছিলাম!

জ্যাঠামশাইয়ের কাছে? অ্যাঁ। তিলু! উনি বেঁচে আছেন এখনো?

তা আছেন।

ডাক্তার বলে ওঠেন, ব্যাপার কী উমা? তোমার সেই ছেড়ে আসা বাড়িটা এই গগনপুরে না কি? এই নাকের ডগায়?

আপনি জানতেন না?

সবই জানতাম! শুধু ওই গ্রামের নামটি বাদে। বলেছিল, ওইটি জিগ্যেস কোরো না।

কী আশ্চর্য! কেন বলতো দিদি?

উমা আস্তে বলল, বড় ভয় হতোরে। মনে হতো যদি কোনো সূত্রে ওরা টের পেয়ে যায় আমি এখানে। বোধ হয় আমার সব সুখ ভেঙে যাবে! এখানেও চ্যালাকাঠ নিয়ে আমায় মারতে ছুটে আসবে।

ডাক্তার বললেন, বড় কুটুম্বু বুঝছো? কী একখানা নাবালক নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। জানতে পারলে তাদের সায়েস্তা করে ছাড়তাম না?

তা' হয়না ডাক্তারবাবু। দিদিই ঠিক বুদ্ধি করেছিল। বোকা হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে।

উমা ও'র কাঁধটা প্রায় খিমচে ধরে বলে ওঠে, কোন ঘরে শুয়েছিলি?

সেই আমাদের ঘরটাতেই। যে ঘরের দরজার পিঠে, তোমার আর আমার নাম খোদাই করা আছে।

অ্যাঁ! সেই নাম দুটো আছে এখনো?

উমা মুখে আঁচল চাপা দেয়।

তিলক বলে ওঠেন, কালি দিয়ে কি রংটং দিয়ে লেখা থাকলে কি আর থাকতো? ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খোদাই করা বলেই আছে দিদি!

তিলু। কোথায় বসে খেলি?

সেই দালানে। তবে একপাশে নয়, মাঝখানে বসে।

সেই দালানটা এখনো আছে?

অবিকল!

সেই দাওয়া, উঠোন, কুয়োতলা ?

সব ! সব ঠিকঠাক ! একই চেহারায় । শুধু আর একটু ভাঙা, ভাঙা আর একটু পচা পচা ।

কী খেলি রে ?

তিলক হেসে ওঠেন । বলেন, কী আর ? ডাল ভাত তরকারি । শুনলাম না কি মুসুরির ডাল আমার দারুণ পছন্দের বলে, জ্যাঠামশাই তাই রাঁধতে আদেশ দিয়েছিলেন ।

তোর দারুণ পছন্দ ছিল ! জ্যাঠামশাই তাই জানতেন, আর মনে রেখে দিয়েছেন । কী আষাঢ়ে গপ্পরে তিলু । মুসুরির ডাল তো তোর দুচক্ষের বিষ ছিল । রান্না হলেই বলতিস, 'ও আমায় দিতে হবে না ।'

তিলক হেসে ওঠেন, তা' সেইটাই হয়তো মনে আছে । শুধু একটু উল্টো হয়ে ।

তিলু ! তিলুরে ! সেই ঘরে শুয়ে তোর আমার কথা মনে পড়েনি ?

তিলক দিদির পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, কী মনে হয় তোর ?

তিলু আর কে কে আছে রে ?

অনেকেই । তারক তালুকদার তো বটেই, তাছাড়া অলক পুলক তাদের বৌরা, তাদের সব ছেলেমেয়েরা !

ওমা । পুলকেরও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে ? ইস ! সেই ক্ষুদে ছেলেটা ! আমায় কী ভালই বাসতো । কেবল পায়ে পায়ে ঘুরতো ! গাবলু গুবলু সেই ছেলেটা—

দিদি ! সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায় ! সেই গাবলু গুবলুটি এখন কাঠির মত !

আহা ! মরে যাই ! কেন রে ?

কেন আর ! দারিদ্র ! সারা বাড়িটায় শুধু দারিদ্রেরই ছাপ ।

ইস ! কিন্তু কেন বলতো ? জ্যাঠামশাইয়ের অতো টাকা ?

লোক ঠকানো টাকা বেশীদিন টেঁকেনা দিদি !

নতুন জ্যেঠির অত গয়না—

নতুন জ্যেঠি নেই । গয়নাগুলো নিয়ে চলে গেছেন কি না বলতে পারি না । যা মায়া ছিল ।

নতুন জ্যেঠি নেই ! আহা !

ডাক্তার কাছে বসে একমনে হাঁটু নাড়িয়ে বলেছিলেন। হেসে উঠে পুনরায় বলেন, সেই মহিলাটি সম্পর্কেও 'আহা।' তিলক মাষ্টার দ্যাখো-মহাপুরুষের নারী সংস্করণ।

আচ্ছা। কী মুস্কিল! মারা গেলে আহা বলবো না?

বলো। বলোনা কে বারণ করছে।

তিলু কে রান্না-টান্না করলো রে?

ওই অলক পুলকের বৌ। দেখে বড় দুঃখ আর মায়া হলো রে। কী রকম বেচারী বেচারী ভাব। বাড়ির কর্তার দাপট তো এখনো ষোলোআনা। অথচ অবস্থা খুবই অভাবের!

আচ্ছা তিলু!

উমা একটু ঢোক গিলে বলে, কেউ যদি ওদের কিছু টাকাপত্তর দেয়, নেবে?

তিলক তার চির বোকা দিদির কোমল হৃদয়টাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। শান্ত গলায় বলে, বোধ হয় নেবেনা। তারক তালুকদারের বংশ হলেও না।

কেন? কী করে জানলি?

উমার স্বর উত্তেজিত।

জানলাম, মানে ছেলেমেয়েদের একটু মিষ্টি খেতে আর বৌদের আশীর্বাদী হিসেবে কিছু দিতে, তাই নিতে চাইছিল না! জ্যাঠামশাই অবশ্য ওদের মত নয়।

হেসে ফেলেন তিলক।

উমা হতাশ গলায় বলল, ওরা সে টাকা ফেরৎ দিল?

না, ফেরৎ দেয়নি। নিতে অস্বস্তি বোধ করছিল।

তাহলে উপহার হিসেবে কিছু দিলে নিতেও পারে অ্যাঁ?

তিলক হেসে ফেলে বলেন, কেন তুমি কিছু প্রেজেনটেশান পাঠাতে চাও নাকি?

আহা। তাই বলছি যেন। তবে এতো অভাব, কষ্ট শুনলে মনটা খারাপ লাগেনা বুঝি।

তা সত্যি! আমারও দেখে ভীষণ খারাপ লাগছিল।

তিলু আমবাগানটা আছে এখনও?

দেখলাম তো আছে।

আমবাগানের খুব লুকনো জায়গায়, একটা গাছের কোটরে আমার একটা জিনিস ঢোকানো ছিল।

এই সেরেছে।

ডাক্তার হেসে উঠে বলেন, সাতরাজার ধন এক মানিক নয়তো ?

উঃ। তোমার কেবলই ঠাট্টা। ছিল—ছিল তুইও জানতিস না তিলু, আমাদের মার গলার একটা সরু হার। ভুলিপিসি একদিন আমায় চুপি চুপি দিয়ে বলেছিল, তুলে রাখ। তোদের মার মরণকালে তোদের বাবা খুলে নিয়ে লুকিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, তুলে রাখো ভুলিদি, আমি বেটা-ছেলে এ সংসারে কোথায় রাখবো। উমা, তিলু বড় হলে দিও ওদের। তো আমিতো এখন কাশীবাসী হতে যাচ্ছি। কোথায় রেখে যাবো বল ? তো আমিই বা কোথায় রাখবো বল নতুন জ্যেঠির চোখ এড়িয়ে ? তো তুই যদি আবার যাস তো—

তিলক একটু হেসে বলেন, ওই বৃক্ষ কোটরে খুঁজে দেখতে না গেলে সেই অমূল্য জিনিসটি চিরকালই থাকবে দিদি। খুঁজতে গেলেই চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে।

রাত বেড়ে উঠছে। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ডাক্তার বলে উঠলেন, এবার নীচে নামা যাক। উমার তো আবার কাসি হয়েছে মনে হচ্ছিল।

কখন আবার কাসি হয়েছে দেখলে ?

আহা না দেখতে কতক্ষণ।

তুমি যাও তো। আমরা যাচ্ছি।…তিলু, সেই ছোটবেলার জায়গাগুলো দেখে তোর দুঃখু হলো না আহ্লাদ হলো রে ?

তিলক হাসলেন, বোধ হয় দুটোই।

তাই, না রে ? আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

ডাক্তার বলে উঠলেন, আবার তোমাদের প্রাইভেট কথায় নাক গলাচ্ছি। ওহে বড়কুটুম, শ্বশুরবাড়ির আদর কেমন, সে তো আর এ অভাগার কপালে কখনো জোটেনি। চলো না হয় একবার সদলবলে যাওয়াই যাক। পূজনীয় বড় শ্বশুরের নামে কিছু উপঢৌকনটৌকন নিয়ে—

আঃ আবার তোমার সেই ঠাট্টা।

উমা উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল তিলু নীচে যাই! আমি যেন তাই বলেছি।

ডাক্তার এখন ঠাট্টার সুর ছাড়েন। বলেন, তুমি বলনি, আমিই বলছি। যাওয়া তো তোমার দরকার। তুমি যে ওদের কথায় জলে ডুব দিয়ে কি গলায় দড়ি না দিয়ে, বেঁচে থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে ওদের কথা মিথ্যে, সেই প্রমাণটা তো দেওয়ার দরকার ছিল। কে জানতো এতো কাছে—তাহলে কবেই কাজটা সেরে আসা যেতো!

উমা ফিকে গলায় বলে, কী যে বল!

ডাক্তার বলেন, কিছুই ভুল বলিনি। কেন, তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছেনা, আর একবার সেই ছেলেবেলার জায়গাটা দেখি।

উমা আরো ফিকে গলায় বলে, আহা, ভারী যেন সুখের জায়গা ছিল।

সুখ-দুঃখর প্রশ্ন নেই, ইচ্ছে হচ্ছে কিনা বুকে হাত দিয়ে একবার বলতো উমারাণী।

উমা ধরা গলায় বলে, 'ইচ্ছে হচ্ছে', আবার কী! সব সময়ই তো হয়।

ব্যাস! ব্যাস! ঠিক আছে। তাহলে তিলু, তোমার এই গোরুর গাড়ির চাকা গড়ানো পর্ব শেষ হলেই একদিন হয়ে যাক অভিযান।

উমা বলে ওঠে, সে তো অনেকদিনের ব্যাপাররে তিলু। যেতেই যদি হয়, তাড়াতাড়ি যাওয়াই তো ভাল। জ্যাঠামশাই কবে আছেন কবে নেই!

ওঁকেও দেখতে ইচ্ছে হয় তোমার?

উমা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, আলাদা করে যে ইচ্ছে হতো তা' নয়। সেই ঘরবাড়ি বাগান পুকুর শিউলি গাছ আমবাগানেই মনটা ঘুরে মরতো! এখনো বেঁচে আছেন শুনে, মনটা কেমন করে উঠছে।